কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সহায়িকা

Funded by the European Union

LEAN
Leadership to Ensure Adequate Nutrition

কনসোর্টিয়াম সদস্য

United Purpose Beyond aid

HELVETAS BANGLADESH

gain Global Alliance for Improved Nutrition

IDF

jum

সহ-অর্থায়নে

pennyappeal

Kingdom of the Netherlands

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

* এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে প্রণীত হয়েছে। এই প্রকাশনার সকল তথ্যের দায়ভার ইউনাইটেড পারপাস -এর। এতে ইউরোপিয়ান কমিশনের মতামতের কোন প্রতিফলন নেই।

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সহায়িকা

সার্বিক সহযোগিতায়
লিডারশিপ টু এনশিওর এডিকোয়েট নিউট্রিশান (লিন) প্রজেক্ট

সংস্করণ
প্রথম

প্রকাশনায়
ইউনাইটেড পারপাস বাংলাদেশ
বাড়ী নং ২৬ (৩য় ও ৪র্থ তলা), রোড ২৮
কে ব্লক, বনানী
ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ

ই-মেইল
upbd.communications@gmail.com

ওয়েবসাইট
united-purpose.org

মুদ্রণে
মাস্টার সিমেক্স পেপার লিমিটেড

আর্থিক সহযোগিতায়
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

*এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে প্রণীত হয়েছে। প্রকাশনার সকল তথ্যের দায়ভার ইউনাইটেড পারপাসের। এতে ইউরোপিয়ান কমিশনের মতামতের কোন প্রতিফলন নেই।

সূচিপত্র

সেশন	বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা
সেশন ১	কৈশোরকালীন খাদ্য ও পুষ্টি পরিচিতি	০৬
সেশন ২	কিশোর ও কিশোরীদের বয়স অনুযায়ী পুষ্টিগত অবস্থা নির্ণয়	১৩
সেশন ৩	খাবারে বৈচিত্র্য	১৬
সেশন ৪	অপুষ্টিজনিত সমস্যা, প্রতিরোধ, প্রতিকার	২১
সেশন ৫	কৈশোরকালীন বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ	২৬
সেশন ৬	বাল্যবিবাহ	২৯
সেশন ৭:	গর্ভকালীন পুষ্টি ও যত্ন	৩২
সেশন ৮	প্রসব পরবর্তী পুষ্টি ও যত্ন	৩৬
সেশন ৯	নবজাতকের প্রতি করণীয়	৪১
সেশন ১০	নিরাপদ খাবার, পানি ও খাবারের গুণগতমান	৪৪
সেশন ১১	ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ	৪৬

সেশনের বিষয়সমূহ

সেশন	বিষয়সমূহ	উপকরণ/পদ্ধতি
সেশন নং ১	**কৈশোরকালীন খাদ্য ও পুষ্টি পরিচিতি** (খাদ্য, পুষ্টি, পুষ্টিকর খাদ্য, খাদ্য উপাদান ও উৎস, কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ, কৈশোরকালে পুষ্টির গুরুত্ব) **সুষম খাবার, দৈনিক পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ** (সুষম খাদ্য, সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, প্রধান পুষ্টি উপাদানসমূহ, বয়স অনুযায়ী প্রতিদিনের শক্তি চাহিদা, প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণসমূহ)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা
সেশন নং ২	**কিশোর ও কিশোরীদের বয়স অনুযায়ী পুষ্টিগত অবস্থা নির্ণয়** (কিশোর-কিশোরীদের বয়স অনুযায়ী আদর্শ ওজন ও উচ্চতা, পুষ্টিগত অবস্থা নির্ণয় করার পদ্ধতি, আদর্শ বিএমআই অনুযায়ী পুষ্টিগত অবস্থা)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা
সেশন নং ৩	**খাবারে বৈচিত্র্য** (জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা, পুষ্টি উপাদান, অভাবজনিত সমস্যা, কিশোর-কিশোরীদের নমুনা খাদ্য তালিকা ও রন্ধন প্রণালীতে নতুনত্ব)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা
সেশন নং ৪	**অপুষ্টিজনিত সমস্যা, প্রতিরোধ, প্রতিকার** (রক্তস্বল্পতা, রক্তস্বল্পতার লক্ষণ, রক্তস্বল্পতার ফলে সমস্যাসমূহ ও প্রতিরোধের উপায়, অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয় ও লক্ষণ, অস্টিওম্যালেসিয়া বা হাড় নরম হয়ে যাওয়া ও লক্ষণ)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা
সেশন নং ৫	**কৈশোরকালীন বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ** (ঋতুস্রাব বা মাসিক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, স্বপ্নদোষ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা
সেশন নং ৬	**বাল্যবিবাহ** (বাল্যবিবাহের পরিণতি, অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ, বাল্যবিবাহের আইন ও শাস্তি)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা
সেশন নং ৭	**গর্ভকালীন পুষ্টি ও যত্ন** (গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, গর্ভবতী মায়ের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োজনীয়তা, গর্ভাবস্থায় পুষ্টির চাহিদা, গর্ভবতী মায়েদের গর্ভাবস্থায় করণীয়, গর্ভবতী মায়ের নমুনা খাদ্য তালিকা)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা

সেশন নং ৮	**প্রসব পরবর্তী পুষ্টি ও যত্ন** (প্রসূতি মায়ের পুষ্টি, স্তন্যদানকালে মায়ের পুষ্টি চাহিদা, দুগ্ধদানকারী মায়েদের দুগ্ধদানকালে করণীয়, প্রসূতি মায়ের নমুনা খাবারের তালিকা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের সহযোগিতার জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের করণীয়)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা
সেশন নং ৯	**নবজাতকের প্রতি করণীয়** (নবজাতকের যত্ন, নবজাতকের মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ, নবজাতকের বিপদচিহ্নসমূহ, নবজাতকের মৃত্যু প্রতিরোধে ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা, নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা
সেশন নং ১০	**নিরাপদ খাবার, পানি ও খাবারের গুণগতমান** (নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, নিরাপদ পানি, নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও পানির প্রয়োজনীয়তা, নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও পানি নিশ্চিত করার জন্য করণীয়)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা
সেশন নং ১১	**ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ** (ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যেমনঃ হাত ধোয়া, নিয়মিত নখ কাটা, দাঁতের যত্ন, গোসল করা, মাসিকের সময় যত্ন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ)	কিশোর-কিশোরী ম্যানুয়াল, পোস্টার ও আলোচনা

সেশন নং ১

কৈশোরকালীন খাদ্য ও পুষ্টি পরিচিতি

নির্দেশনা ১ সময়: ৫ মিনিট

শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তারপর অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন খাদ্য ও পুষ্টি কি? কয়েকজনের ধারণা যাচাই করে, বিষয়গুলো জানিয়ে আলোচনা শুরু করুন।

এবার নিচে বর্ণিত প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন ও প্রয়োজনীয় উদাহরণ দিন।

কৈশোরকালে শরীরের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। বিশেষ করে শরীরের কাঠামোগত বৃদ্ধির জন্য এসময় যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর ও সুষম খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন। এসময় দেহের চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ না করলে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক পরিপক্কতা সঠিকভাবে গড়ে উঠেনা। কৈশোরকালীন এই সময়কে missed opportunities বলা হয়। কারণ শিশুকালে যদি শরীরে পুষ্টির কোন ঘাটতি থাকে তা এসময় পূরণ করা সম্ভব। তাই এসময়টি পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়নের জন্য একটা শেষ সুযোগ।

এই সেশনটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা থাকবে।

১. খাদ্য উপাদান ও উৎস, কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ ও কৈশোরকালে পুষ্টির গুরুত্ব ।

২. সুষম খাবার, দৈনিক পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ।

খাদ্য উপাদান ও উৎস, কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ ও কৈশোরকালে পুষ্টির গুরুত্ব

নির্দেশনা-২ সময়: ২০ মিনিট

খাদ্য ও পুষ্টি কী? পুষ্টিকর খাদ্য কেন প্রয়োজন? খাদ্য উপাদান ও উৎসগুলো কী কী? কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ ও উদাহরণ, কৈশোরকালে কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির গুরুত্ব এবং পুষ্টির অভাবে কী কী অসুবিধা হতে পারে। এসকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন প্রয়োজনীয় উদাহরণ দিয়ে। আলোচনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ছবি প্রদর্শন করুন। কয়েকজনকে বিষয়গুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। ফলে তারা কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা যাচাই করতে পারবেন।

খাদ্য

খাদ্য হল এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদানের সমষ্টি, যা গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বজায় থাকে। দেহের ক্ষয়পূরণ ও বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে।

পুষ্টি

পুষ্টি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রহণ করা খাদ্য শোষিত হয়ে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে, শরীরের বৃদ্ধি সাধন করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। অন্যভাবে বলা যায়, খাদ্যের সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্কই হলো পুষ্টি। অর্থাৎ স্বাস্থ্য গঠনে খাদ্যের ভূমিকা অথবা খাদ্যের সাথে সুস্থ-সবল ও কর্মক্ষম স্বাস্থ্য গঠন এবং তা বজায় রাখার জন্য যে যোগসূত্র সে প্রক্রিয়াকে আমরা পুষ্টি বলি।

পুষ্টিকর খাদ্য

যে সকল খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদিত হয়, দেহের গঠন বৃদ্ধি হয়, শরীর সবল, কর্মক্ষম ও নিরোগ থাকে তাকেই পুষ্টিকর খাদ্য বলে।

খাদ্য ও পুষ্টি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। যেকোন খাদ্য কেবল গ্রহণ করলেই হবে না, তা অবশ্যই পুষ্টিকর ও নিরাপদ হতে হবে। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, এবং শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগের জন্ম নেয়। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকে।

খাদ্য উপাদান ও উৎস

খাদ্যের যে সব রাসায়নিক উপাদান দেহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে সেগুলোই খাদ্য উপাদান নামে পরিচিত। খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ৬ টি-

ক্র.নং	উপাদানের নাম	উৎস
১	শ্বেতসার বা শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)	ভাত, রুটি, আলু, মুড়ি, চিড়া, খই, চিনি, মধু ইত্যাদি।
২	তেল ও চর্বি	তেল, মাছ-মাংসের চর্বি, মাখন, ঘি ইত্যাদি।
৩	আমিষ (প্রোটিন)	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, বাদাম, বীজ জাতীয় খাবার ইত্যাদি।
৪	ভিটামিন	দুধ, ডিম, কলিজা, সব ধরনের শাক-সবজি, ফল ইত্যাদি।
৫	খনিজ উপাদান	মাছ, মাংস, কলিজা, দুধ, ডিম, গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, লবণ ইত্যাদি ।
৬	পানি	-

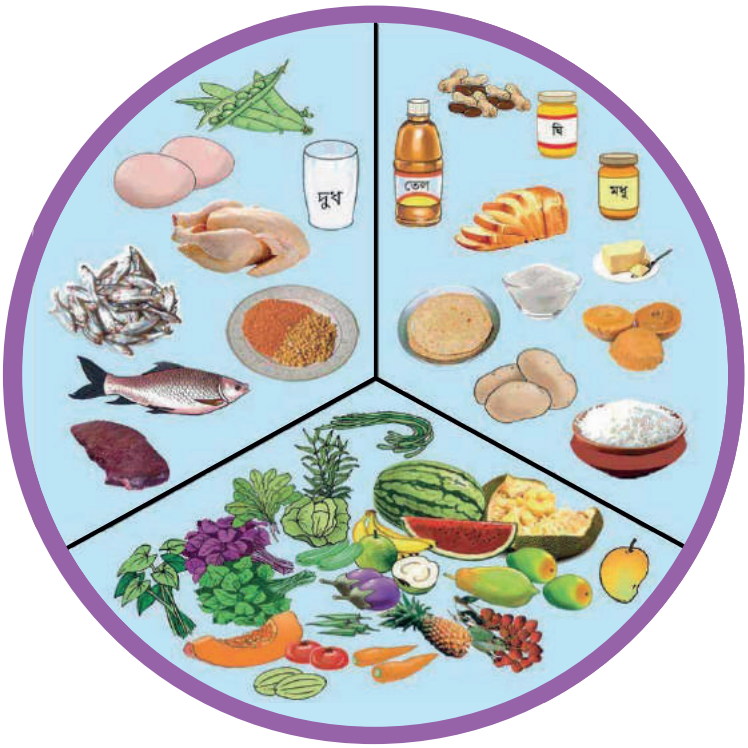

খাদ্য উপাদান ও উৎস

কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ

খাদ্যের ভাগ	**উদাহরণ**
১. **তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য** (শর্করা ও চর্বি জাতীয়)	ভাত, রুটি, আলু, চিনি, তেল ইত্যাদি। (স্থানীয়ভাবে যোগাড় করা খাবারের উদাহরণ দেয়া যাবে)
২. **শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিকারক খাদ্য** (আমিষ জাতীয়)	সব ধরনের মাংস (মুরগি/গরু/খাসি/শুকর), ছোট-বড় মাছ, কলিজা, শুটকি মাছ, নাপ্পি, শামুক, ডিম, দুধ ইত্যাদি। (স্থানীয়ভাবে যোগাড় করা খাবারের উদাহরণ দেয়া যাবে)
৩. **রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য** (ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ)	লাল শাক, কচু শাক, পাকা পেঁপে, আমড়া, মিষ্টিকুমড়া ইত্যাদি। (স্থানীয়ভাবে যোগাড় করা খাবারের উদাহরণ দেয়া যাবে)

কৈশোরকালে পুষ্টির গুরুত্ব

১০-১৯ বছর বয়স শরীর বা দেহ বৃদ্ধির সঠিক সময়। কৈশোরে দেহের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। ফলে, এই বয়সে শরীরে পুষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকে। এই সময়টি শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই বৃদ্ধির সাথে মানবিকবোধ, আবেগানুভূতি ও হরমোন সংক্রান্ত পরিবর্তনও জড়িত।

কিশোরীদের ক্ষেত্রে পুষ্টির গুরুত্বঃ

১. কৈশোরকালে মেয়েদের উচ্চতা ও ওজন বাড়ে এবং মানসিক পরিপক্কতা আসে। এসময় চাহিদা অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করলে কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয়।

২. ঋতুস্রাব বা মাসিকের ফলে শরীর থেকে অনেক রক্ত বের হয়ে যায়। একারণে শরীরে রক্তের ঘাটতি পূরণের জন্য পরিমিত পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার বিশেষ করে লৌহযুক্ত খাবার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৩. গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ঝুঁকি ও কম ওজনের শিশু জন্মদানের সম্ভাবনা কমানোর জন্য, কিশোরীদের ক্ষেত্রে পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কিশোরদের ক্ষেত্রে পুষ্টির গুরুত্বঃ

১. কৈশোরকালে ছেলেদের উচ্চতা ও ওজন বাড়ে, শরীরে দৃঢ়তা আসে, বুক-কাঁধ চওড়া হয়, বীর্যপাত হয়। ফলে, এসময়ে দেহের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করা আবশ্যক।

২. পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ফলে কিশোরদের শরীরের মাংসপেশি পরিপূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

৩. পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করলে কিশোরদের প্রজনন ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে।

কৈশোরকালের সঠিক পুষ্টি উপাদান গ্রহণ কিশোর-কিশোরীদের পড়াশুনায় মনোযোগ বৃদ্ধি করে, পরবর্তীকালে শারীরিক আকার-আকৃতি, কর্মক্ষমতা তৈরি করে। কৈশোরে মানুষের জীবনযাত্রা ও খাবারের রুচির পরিবর্তন হয়। এ সময়ে সঠিক মাত্রার পুষ্টি উপাদান গ্রহণ না করলে, কিশোর-কিশোরীরা পুষ্টিজনিত নানা রোগ ও সমস্যায় ভুগে থাকে।

অপর্যাপ্ত পুষ্টি কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। যেমনঃ

১. আয়রনের ঘাটতির কারণে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ কমে যায়। পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ হারায়। ফলে, স্কুলে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

২. কিশোরীদের মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে শরীরে আয়রনের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে পর্যাপ্ত আয়রনসমৃদ্ধ খাবার না খেলে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

৩. পুষ্টিকর খাবার না খাওয়ায় এবং বাইরের মুখরোচক খাবার খাওয়ার কারণে কিশোর-কিশোরীদের দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয়ে স্থূলতা সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে অনেক কম বয়সেই ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট, কিডনি সমস্যাজনিত অনেক জটিল রোগের জন্ম দেয়।

৪. সবুজ শাকসবজি কম গ্রহণের ফলে মেয়েদের ডিম্বাশয়ে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

৫. চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ না করলে কিশোরদের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।

৬. কিশোরী অবস্থায় গর্ভধারণ (বিশেষ করে মা যদি অপুষ্টিতে ভোগেন) মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়।

অতিরিক্ত কায়িক শ্রম, মানসিক ও শারীরিক চাপ কৈশোরকালে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। পরিবারের মধ্যে খাবার বিতরণ ও গ্রহণে ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রথাগত বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যায়। একারণে অনেক সময় শৈশব থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত মেয়েরা অপুষ্টির শিকার হয়ে থাকে।

সুষম খাবার, দৈনিক পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ

নির্দেশনা-৩ সময়: ১৫ মিনিট

শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন সুষম খাবার কী? কয়েকজনের উত্তর নিয়ে এরপর ব্যাখ্যা করুন সুষম খাবার কাকে বলে। তারপর সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, প্রধান পুষ্টি উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করুন। পরবর্তীতে বয়স অনুযায়ী প্রতিদিনের শক্তি চাহিদা, এবং দৈনিক প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি উপাদানের পরিমাণসমূহ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। আলোচনার সাথে প্রয়োজনীয় পোস্টার বা ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শন করুন।

সুষম খাবার

যে খাবারে শরীরের প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য উপাদান সঠিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাকে সুষম খাবার বলে। সুষম খাবারে খাদ্যের সব পুষ্টি উপাদান দেহের প্রয়োজন মত এবং বয়স, লিঙ্গ, কাজের ধরন, শারীরিক অবস্থাভেদে সঠিক মাত্রায় থাকে। এ খাবারে শক্তিদায়ক, শরীর বৃদ্ধিকারক ও রোগ প্রতিরোধী খাদ্য উপাদান পরিমাণ মত পাওয়া যায়।

সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

- কৈশোরে শরীরের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য।
- শরীরের কাঠামোগত বৃদ্ধির জন্য।
- গ্রোথ হরমোন নামক এক বিশেষ হরমোন শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ তৈরি হতে সহায়তা করে। যা দ্রুত শরীর বৃদ্ধির কাজ করে।
- চাহিদা মাফিক পুষ্টিকর ও সুষম খাবার না খেলে শরীরের বৃদ্ধি পুরোপুরি হয় না।
- এই সময়ে পুষ্টি গ্রহণের উপর নির্ভর করে কিশোর-কিশোরীদের দেহের উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়টিও।

প্রধান পুষ্টি উপাদানসমূহ

যে সকল পুষ্টি উপাদান আমাদের দেহে অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে বলা হয় প্রধান পুষ্টি উপাদান। প্রধান পুষ্টি উপাদান তিন ধরনের: ১. শর্করা ২. আমিষ ৩. স্নেহ

অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ

অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ আমাদের অতি সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন, কিন্তু এগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করা না হলে, একজন মানুষ অসুস্থ অথবা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। খাদ্যে অনেক ধরনের অনুপুষ্টি আছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল-

১.ভিটামিন এ
২.ভিটামিন বি (কমপ্লেক্স)
৩.ভিটামিন সি
৪.ভিটামিন ডি
৫.আয়রন
৬.আয়োডিন
৭.জিংক
৮.ক্যালসিয়াম

একই খাদ্যে একাধিক অনুপুষ্টি পাওয়া যায়। অনুপুষ্টির অভাব প্রতিরোধ করতে হলে নিয়মিত বিভিন্ন রঙের ফলমূল, শাকসবজি এবং প্রাণিজ খাবার খেতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের প্রত্যেক বয়সের শক্তির চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়। এসময় দেহের বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে সাথে শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

বয়স অনুযায়ী প্রতিদিনের শক্তি চাহিদা (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা: ২০০১)

বয়স (বছর)	কিশোরীদের জন্য প্রতিদিনের শক্তি চাহিদা (কিলোক্যালোরি/দিন)	কিশোরদের জন্য প্রতিদিনের শক্তি চাহিদা (কিলোক্যালোরি/দিন)
১০-১১	২০০৬	২১৫০
১১-১২	২১৪৯	২৩৪১
১২-১৩	২২৭৬	২৫৪৮
১৩-১৪	২৩৭৯	১৭৭০
১৪-১৫	২৪৪৯	২৯৯০
১৫-১৬	২৪৯১	৩১৭৮
১৬-১৭	২৫০৩	৩৩২২
১৭-১৮	২৫০৩	৩৪১০

নিম্নে বয়স অনুযায়ী দৈনিক শক্তি ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণসমূহ দেয়া হলো:

খাদ্য উপাদান	কিশোরী		কিশোর	
	১০-১৮ বছর	১৯ বছর	১০-১৮ বছর	১৯ বছর
শর্করা (% মোট শক্তি)	৫০-৫৫%		৫০-৫৫%	
আমিষ (গ্রাম)	২৬.২-৪৭.৪	৩৩	২৫.৯-৫৭.৯	৩৩
স্নেহ/তেল (% মোট শক্তি)	২৫-৩৫	২০	২৫-৩৫	২০
ভিটামিন এ (মি. গ্রা.)	৬০০	৫০০	৬০০	
থায়ামিন (মি. গ্রা.)	১.১		১.২	
রিবোফালাভিল (মি. গ্রা.)	১-১.১		১.৩	
নায়াসিন (মি. গ্রা. NEs)	১৬	১৪	১৬	
ভিটামিন বি ১২ (মি. গ্রা.)	২.৪		২.৪	
ফোলেট (DEF) (মি.গ্রা.)	৪০০		৪০০	
ভিটামিন সি (মি. গ্রা.)	৪০	৪৫	৪০	৪৫
ভিটামিন ডি (মি. গ্রা.)	৫		৫	
ভিটামিন ই (মি. গ্রা.)	১১-১৫		১১-১৫	
ক্যালসিয়াম (মি. গ্রা.)	১৩০০	১০০০	১৩০০	১০০০
ফসফরাস (মি. গ্রা.)	১২৫০	৭০০	১২৫০	৭০০
আয়োডিন (মি. গ্রা.)	১২০-১৫০		১২০-১৫০	
আয়রন (মি. গ্রা.) ১০% জৈব প্রাপ্যতা অনুযায়ী	৮.৯-৩২.৭	২৯.৪	৮.৯-১৮.৮	১৩.৭
জিংক (মি.গ্রা.) মাঝারি জৈব প্রাপ্যতা অনুযায়ী	৭.২	৪.৯	৮.৬	৭
আঁশ (গ্রাম)	২০-২৫		২৪-৩০	
ম্যাগনেসিয়াম (মি.গ্রা.)	২৩০	২৬০	২২০	

মূলবার্তা:

- কৈশোরে দেহের বৃদ্ধি, বিশেষ করে শরীরের কাঠামোগত বৃদ্ধির জন্য এ সময় প্রচুর পরিমাণে আমিষ এবং আয়রন ও ক্যালসিয়ামসহ অন্যান্য অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ এবং পুষ্টিকর সুষম খাবার খাওয়া প্রয়োজন।
- দেহের চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টিকর এবং সুষম খাবার না খেলে স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

সেশন নং ২

কিশোর ও কিশোরীদের বয়স অনুযায়ী পুষ্টিগত অবস্থা নির্ণয়

নির্দেশনা-৪ সময়: ১৫ মিনিট

আলোচনা শুরুর আগেই অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন, বি.এম.আই কী? বিএমআই কোন বিষয়ের সাথে সাথে সম্পর্কিত। উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। প্রথমেই কিশোর-কিশোরীদের বয়স অনুযায়ী আদর্শ ওজন ও উচ্চতা কেমন হওয়া উচিত, ও পুষ্টিগত অবস্থা নির্ণয় করার পদ্ধতি, আদর্শ বি.এম.আই পরিমাপ করার পদ্ধতি, এবং সে অনুযায়ী কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টিগত অবস্থা নির্ধারণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। শেষে অংশগ্রহণকারীরা সঠিকভাবে বি.এম.আই পরীক্ষা করতে পারছে কি না তা যাচাই করুন।

কিশোর-কিশোরীদের বয়স অনুযায়ী আদর্শ ওজন ও উচ্চতা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী, বয়সের সাথে সাথে দেহের ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির একটি আদর্শ মান রয়েছে। নিম্নে কিশোর-কিশোরীদের বয়স অনুযায়ী আদর্শ ওজন ও উচ্চতা দেয়া হলো-

বয়স (বছর)	কিশোরী		কিশোর	
	আদর্শ ওজন (কেজি)	আদর্শ উচ্চতা (সে.মি.)	আদর্শ ওজন (কেজি)	আদর্শ উচ্চতা (সে.মি.)
১০	৩২	১৩৮.৬	৩২	১৩৭.৮
১১	৩৬	১৪৫.০	৩৩	১৪৩.১
১২	৪১	১৫১.২	৩৯	১৪৯.১
১৩	৪৬	১৫৬.৪	৪৭	১৫৬.০
১৪	৫০	১৫৯.৮	৪৯	১৬৩.২
১৫	৫২	১৬১.৭	৫৭	১৬৯.০
১৬	৫৪	১৬২.৫	৫৯	১৭২.৯
১৭	৫৫	১৬২.৯	৬৮	১৭৫.২
১৮	৫৬	১৬৩.১	৭০	১৭৬.১
১৯	৫৭	১৬৩.২	৭২	১৭৬.৫

উৎস: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০০৭)

বি.এম.আই (Body Mass Index):

কোন ব্যক্তির ওজন এবং উচ্চতার বর্গের অনুপাতই হলো বি.এম.আই। একে পুষ্টিগত অবস্থা নির্ণয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে ধরা হয়। বি.এম.আই বের করতে ব্যক্তির ওজনের কিলোগ্রাম একক এবং উচ্চতার মিটার একক জানা প্রয়োজন। ওজনকে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলেই বি.এম.আই পাওয়া যাবে। নিচে সূত্রটি দেয়া হলো-

$$\text{বি.এম.আই} = \frac{\text{ওজন (কিলোগ্রাম)}}{\text{উচ্চতা (মিটার)}^{২}}$$

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, ১৫ বছরের একজন কিশোরের ওজন ২৮ কিলোগ্রাম এবং উচ্চতা ১.২৫ মিটার, তাহলে তার বি.এম.আই হবে-

$$\text{বি.এম.আই} = \frac{২৮}{১.২৫ \times ১.২৫} = ১৭.৯২$$

এবং ১৩ বছরের একজন কিশোরীর ওজন ৫০ কিলোগ্রাম এবং উচ্চতা ১.৫০ মিটার, তাহলে তার বি.এম.আই হবে,

$$\text{বি.এম.আই} = \frac{৫০}{১.৫০ \times ১.৫০} = ২২.২২$$

শরীরের পুষ্টি পরিমাপের একটি সূচক হল BMI, নিচের নরমোগ্রামটি* একটি নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে:

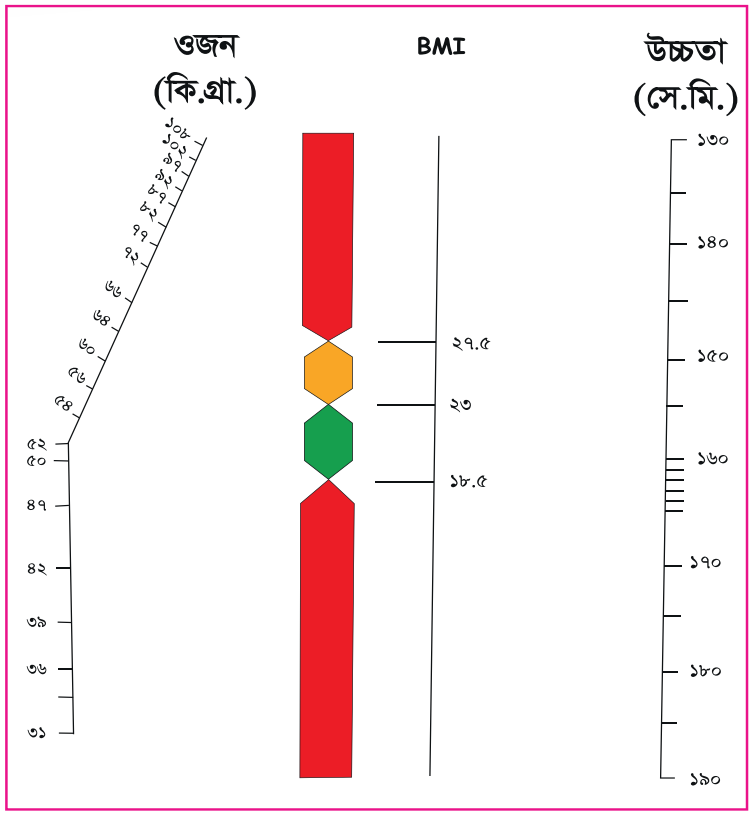

BMI নির্ণয়ের নরমোগ্রাম

**ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশন, ইন্ডিয়া ; ইন্ডিয়ান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল, ২০০৬*

১০-১৯ বছর বয়েসি কিশোরীদের আদর্শ বি.এম.আই অনুযায়ী পুষ্টিগত অবস্থা:

বয়স (বছর)	আদর্শ বি.এম.আই	মৃদু অপুষ্টি	মৃদু স্থূলতা
১০	১৬.৬	১৪.৮	১৯.০
১১	১৭.২	১৫.৩	১৯.৯
১২	১৮.০	১৬.০	২০.৮
১৩	১৮.৮	১৬.৬	২১.৮
১৪	১৯.৬	১৭.২	২২.৭
১৫	২০.২	১৭.৮	২৩.৫
১৬	২০.৭	১৮.২	২৪.১
১৭	২১.০	১৮.৪	২৪.৫
১৮	২১.৩	১৮.৬	২৪.৮
১৯	২১.৪	১৮.৭	২৫.০

উৎস: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০০৭)

১০-১৯ বছর বয়েসি কিশোরদের আদর্শ বি.এম.আই অনুযায়ী পুষ্টিগত অবস্থা :

বয়স (বছর)	আদর্শ বি.এম.আই	মৃদু অপুষ্টি	মৃদু স্থূলতা
১০	১৬.৪	১৪.৯	১৮.৫
১১	১৬.৯	১৫.৩	১৯.২
১২	১৭.৫	১৫.৮	১৯.৯
১৩	১৮.২	১৬.৪	২০.৮
১৪	১৯.০	১৭.০	২১.৮
১৫	১৯.৮	১৭.৬	২২.৭
১৬	২০.৫	১৮.২	২৩.৫
১৭	২১.১	১৮.৮	২৪.৩
১৮	২১.৭	১৯.২	২৪.৯
১৯	২২.২	১৯.৬	২৫.৪

উৎস: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০০৭)

মূলবার্তা:

- পুষ্টিগত অবস্থা নির্ণয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে বি.এম.আই। এই পরিমাপের মধ্যে দিয়ে বোঝা যাবে কিশোর-কিশোরী স্থূলতায় ভুগছে নাকি পুষ্টিহীনতায়।

সেশন নং ৩

খাবারের বৈচিত্র্য

কৈশোরকালীন বৈচিত্র্যময় খাবারের গুরুত্ব

কৈশোরকালে পুষ্টি সমস্যার সাথে প্রথাগত শারীরিক, মানসিক ও আর্থ-সামাজিক কারণ জড়িত থাকে। কৈশোরকালে খাবারের পরিমাণ সঠিক থাকতে হবে। একই সাথে খেয়াল রাখতে হবে যেনো খাবারের ৬টি উপাদানই বিদ্যমান থাকে। একই খাবার বার বার খেতে ভালো লাগবে না, তাই মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাবার দেওয়া উচিত। এতে খাবারের রুচি বজায় থাকবে। কিশোর-কিশোরী সহ সবার জন্য ঘরে তৈরি খাবারই উত্তম। তাই তাদের ঘরে তৈরি করা পুষ্টিকর খাবার খেতে দিতে হবে।

তবে কৈশোরে ছেলে-মেয়েরা রাস্তার খোলা খাবার, চানাচুর, আচার, মুড়ালি, চটপটি, চিপস, আইসক্রিম, কেক, কোমল পানীয়, জুস, এ্যানার্জি ড্রিংক ইত্যাদি মুখরোচক খাবার খেতে পছন্দ করে। এগুলোতে চর্বি ও শর্করার মাত্রা বেশি থাকে। যা পরবর্তী জীবনে স্থূলতা, হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

কীভাবে খাবারে বৈচিত্র্য আনা যায়

- সব ধরনের খাবার পরিমাণ মত খেতে হবে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন খাবারে ভিন্ন ভিন্ন পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান।
- এই সব খাবার যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি, আমিষ এবং অণুপুষ্টি চাহিদা পূরণ করে।
- ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাবার গ্রহণের ফলে খাওয়ার রুচিও বাড়ে।

পরিমিত পুষ্টি থেকে আসে সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্য অর্জন ও রক্ষার জন্য সুষম খাবার গ্রহণ অপরিহার্য। সেই সাথে দিনে কমপক্ষে ১.৫-৩.৫ লিটার অর্থাৎ ৬-১৪ গ্লাস নিরাপদ পানযোগ্য খাবার পানি পান করা প্রয়োজন। দিনের খাবারে অন্তত ১০০ গ্রাম শাক ও ২০০ গ্রাম সবজি এবং ১০০ গ্রাম মৌসুমি ফল থাকা উচিত। যা থেকে শরীরের প্রয়োজনীয় অণুপুষ্টি এবং খাদ্য আঁশের চাহিদা মিটবে।

জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা, পুষ্টি উপাদান, অভাবজনিত সমস্যা

নির্দেশনা-৫ সময়: ৩০ মিনিট

খাবারে পুষ্টি উপাদানগুলো কী কী থাকে তা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন? উত্তরগুলো শুনে নিয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের উৎসসমূহ এবং উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। এসব পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত কারণে কোন ধরনের সমস্যা হতে পারে তা আলোচনায় যুক্ত করুন। সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন। আলোচনা শেষে শিখন ফল যাচাই করার লক্ষ্যে, কয়েকটি অভাবজনিত সমস্যা জিজ্ঞেস করুন। সমস্যা প্রতিরোধে কোন ধরনের পুষ্টি উপাদান শরীরের জন্য প্রয়োজন তা জানার চেষ্টা করুন। সবশেষে খাদ্য তালিকা তৈরি করার অনুশীলন করান।

নিম্নে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের উৎসমূহ, এর উপকারিতা ও অভাবজনিত সমস্যার একটি ছক দেয়া হলো:

পুষ্টি উপাদান	প্রধান উৎসমূহ ও পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রামে)*	উপকারিতা	অভাবজনিত সমস্যা
শর্করা	রুটি (৪৯.৭ গ্রা.), ভাত (২৪.৩ গ্রা.), আলু (১৪.২ গ্রা.), চিনি (৯৯.৫ গ্রা.) ইত্যাদি।	• শরীরে শক্তি ও কাজ করার ক্ষমতা যোগায়।	• রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস পায়। • ওজন কমে যায় এবং দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
আমিষ	প্রাণিজ: গরু/মুরগির মাংস (১৯.২ গ্রা.), ট্যাংরা (১৮.২ গ্রা.), কৈ (১৭.৫ গ্রা), চিংড়ি (১৭.৬ গ্রা.), পাঙ্গাস (১৫.৯ গ্রা.), মুরগি/হাঁসের ডিম (১৬.৫/১৪.৩ গ্রা.) ইত্যাদি। উদ্ভিজ্জ: মসুর ডাল (২৭.৭ গ্রা.)	• শরীর গঠনে সাহায্য করে। • শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করে।	• দেহের গঠন ও বৃদ্ধি হয়। • অপুষ্টির শিকার হয়।
স্নেহ/তেল	সয়াবিন তেল (১০০ গ্রা.), ঘি (৯৯.৮ গ্রা.), মাখন (৮১ গ্রা.), চিনাবাদাম (৪৬.৬ গ্রা.) ইত্যাদি।	• কর্মক্ষমতার উৎস হিসেবে কাজ করে। • দেহে শক্তি যোগায় এবং অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের চাহিদা পূরণ করে।	• শরীরে তাপ উৎপাদন কমে যায়। • কর্মশক্তি হ্রাস পায়। • ভিটামিন এ, ডি, ই, কে-এর অভাব হয় এবং অন্যান্য অণুপুষ্টি ও মিনারেলস এর শোষণ বাধাগ্রস্ত হয়।
ভিটামিন এ	খাসির কলিজা (৮২৫০ মি.গ্রা.), মলা মাছ (২৬৪০ মি.গ্রা.), মিষ্টি কুমড়া (৫৫৪ মি. গ্রা.), গাজর (৩৬৪ মি. গ্রা.), লাল শাক (৭৯৩ মি.গ্রা.) ইত্যাদি।	• দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। • চোখ সুস্থ রাখে এবং দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে। • ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করে। • চুলের সৌন্দর্য, ঔজ্জ্বল্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করে। • ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে।	• রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, ঘন ঘন অসুস্থ হয়। • হজম ক্ষমতা হ্রাস পায়, প্রায়শই পেটের অসুখ হয়। ডায়রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়। • ত্বক খসখসে হয়। • চুল লালচে হয় এবং সহজেই পড়ে যায়। • রাতকানা রোগ হয়। ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাইয়ে এ রোগ সহজেই দূর করা যায়, চিকিৎসা না করলে ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তির অবনতি ঘটে এবং স্থায়ী অন্ধত্ব হয়। • শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।

ভিটামিন বি কমপ্লেক্স	ঢেঁকিছাঁটা চাল, মুরগি/গরুর কলিজা, চিনাবাদাম, ফুলকপি, বরবটি ইত্যাদি।	• দেহ কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। • বিপাকক্রিয়ায় সহায়তা করে। • রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। • স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে। • হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। • কর্মশক্তি বাড়ায়।	• জিহবা ও ঠোঁটের কোনায় ঘা হয়। • রক্তস্বল্পতা হয়, হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। • কর্মক্ষমতা কমে যায় এবং অল্পেই ক্লান্ত হয়ে যায়। • স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। • নানা ধরনের স্নায়বিক রোগ দেখা দেয়। হাত পা ঝিম ঝিম করে। • গর্ভবতী মায়েদের কিছু সমস্যা দেখা দেয়। • মুখে দানা (ব্রণ) উঠে, ত্বক খসখসে হয়।
ভিটামিন সি	আমলকি (৪৫৩.৪ মি. গ্রা.), পেয়ারা (২২৮.৩ মি. গ্রা.), জাম্বুরা (১২১.৭ মি.গ্রা.),	• রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। • টিস্যু (কোষ-কলা, কোলাজেন টিস্যু) গঠনে অত্যাবশ্যক। • বাড়ন্ত শিশু ও ছেলে-মেয়েদের হাড় মজবুত করে। • ফল এবং শাক-সবজিতে বিদ্যমান লৌহ শোষণ হতে সাহায্য করে। • ক্ষত শুকাতে সহায়তা করে। • সর্দি-কাশি প্রতিরোধ ও প্রতিকার করে। • দাঁতের মাড়ি মজবুত করে। • বার্ধক্যে ত্বকে ভাঁজ পড়া বিলম্বিত করে। • ক্যান্সার, হৃদরোগ ও বার্ধক্যজনিত জটিলতা প্রতিরোধ করে।	• সর্দি, কাশি সহ ঘন ঘন অসুস্থতা দেখা দেয়। • রক্তস্বল্পতা। • হাড় ও মাড়ি দুর্বল হয়। • হাড়ে ও গিরায় ব্যাথা হয়। • হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। • মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে।
ভিটামিন ডি	কার্ফু মাছ (৬.৬ মি. গ্রা.), ভেটকি শুটকি (৫.৭ মি. গ্রা.), তেলাপিয়া ৫.৫ মা. গ্রা.), ডিম (২.৬ মি. গ্রা.) ইত্যাদি।	• মজবুত হাড় ও দাঁত গঠনে সহায়তা করে। • আঘাতজনিত রক্তপাত বন্ধ করে।	• হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত হয় না। • দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। • রিকেট রোগ হয়।

ভিটামিন ই	চিনাবাদাম (১০.৯ মি.গ্রা.) ডিমের কুসুম (৪.১৬ মি. গ্রা.), ভোজ্য তেল (১৬.০৬ মি. গ্রা.), কচু শাক (৩.৩৬ মি. গ্রা.), সরিষা বীজ ইত্যাদি।	• অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে রোগ প্রতিরোধ করে। • হৃদরোগ ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। • ভিটামিন এ-এর কাজে সহায়তা করে, চোখ সুস্থ রাখে। • প্রজননক্ষমতা বৃদ্ধি করে।	• স্নায়ুতন্ত্রের তথ্য প্রেরণে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। • পেশির সঠিক ঘনত্ব বজায় থাকে না। • চোখের রেটিনার পুনর্গঠনে বাধা দেয়।
ক্যালসিয়াম	চ্যালা/পুঁটি/মলা মাছ (৩৫৯০/৯৬৭/৭৬৭ মি.গ্রা.), গরুর দুধ (১০৩ মি.গ্রা.) মুরগির ডিম (১২০ মি.গ্রা.), ঢেঁড়স (৯৩ মি. গ্রা.), মটরশুটি (৪৩ মি. গ্রা.) ইত্যাদি।	• হাড় মজবুত করে। • হাড়ের গঠন বৃদ্ধি পায়। • রক্তজমাট বাঁধতে সাহায্য করে। • হৃদযন্ত্রের কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়। • বার্ধক্যে অস্টিওম্যালেসিয়া কিংবা হাড় নরম হয়ে যাওয়া রোধ করে। • মায়ের বুকের দুধ তৈরিতে সহায়তা করে।	• হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত হয় না। • রক্তজমাট বাধাপ্রাপ্ত হয়। • মাংসপেশির সংকোচন বাধাপ্রাপ্ত হয়। • হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। • মায়ের বুকের দুধ উৎপাদন ব্যাহত হয়। • বার্ধক্যে অস্টিওম্যালেসিয়া কিংবা হাড় নরম হয়ে যাওয়া রোগ দেখা দেয়।
আয়োডিন	আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক মাছ, সমুদ্র উপকূলবর্তী শাকসবজি ইত্যাদি।	• মানসিক ও শারীরিক বিকাশ ঘটায়।	• গলগণ্ড রোগ হয়। • স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। • মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে। • গর্ভপাত ঘটতে পারে ও মৃত শিশুর জন্ম হতে পারে। • শিশুর মৃত্যু হতে পারে।
আয়রন (লৌহ)	মুরগির কলিজা (৯.০ মি.গ্রা.), ডাটা শাক (৭.৪ মি.গ্রা.),	• রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে।	• রক্তস্বল্পতা/অ্যানিমিয়া ইত্যাদি। • অল্প পরিশ্রমে অধিক ক্লান্তি।
	চেলা/মলা মাছ (৫.৪/৩.৮ মি.গ্রা.), লাল শাক (৫.৩ মি.গ্রা.) ইত্যাদি।	• কোষে অক্সিজেন পরিবহন করে। • রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করে।	• নখ ভঙ্গুর হয়। • মেজাজ খিটখিটে হয়। • শারীরিক দুর্বলতা বাড়ে।
জিংক	দুধ (৪.৭ মি.গ্রা.), মাংস (৪.৬ মি.গ্রা), মসুর/ছোলার ডাল (৩.৮৯ মি.গ্রা.), চাঁদা মাছ (২.৪৫ মি. গ্রা.), ডিম (৩.৩ মি. গ্রা.), কাচকি মাছ (৩.১ মি. গ্রা.) ইত্যাদি।	• আমিষ গঠন ও সংশ্লেষণে সহায়তা করে। • দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। • রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।	• শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। • শিশুদের ডায়রিয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। • জননাঙ্গের গঠন ও বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে হয় না। • হাড়ের পরিপক্কতা ব্যাহত হয়। • বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

কিশোর-কিশোরীর নমুনা খাদ্য তালিকা

নির্দেশনা-৬ সময়: ১৫ মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে কয়েকজনের খাদ্য তালিকার ধারণা নিন। ২৫০ মি.লি. বাটির হিসাব করে কিশোর-কিশোরীর নমুনা খাদ্য তালিকা কেমন হওয়া উচিত তা জানান। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন। আলোচনা শেষে পুষ্টিকর খাদ্য রান্নার প্রদর্শনী বা প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন।

খাদ্য তালিকা (২৫০ মি.লি. বাটির হিসাব):

সকালের নাস্তা
১. মাঝারি সাইজের দুটি রুটি অথবা এক বাটি ভাত। ২. সবজি এক বাটি। ৩. ডিম এক বাটি।
মধ্য দুপুরের খাবার
১. যেকোন দেশি মৌসুমি ফল ২. বাড়িতে তৈরি নাস্তা জাতীয় খাবার
দুপুরের খাবার
১. ভাত ২/৩ বাটি। ২. শাক-সবজি এক বাটি। ৩. ঘন ডাল এক বাটি। ৪. মাছ/মাংস/কলিজা এক টুকরা।
বিকালের নাস্তা
১. দুধ দিয়ে তৈরি ঘন যেকোন খাবার। ২. যেকোন দেশি মৌসুমি ফল/বাড়িতে তৈরি নাস্তা জাতীয় যেকোন খাবার।
রাতের খাবার
১. ভাত ২/৩ বাটি। ২. শাকসবজি এক বাটি। ৩. ঘন ডাল এক বাটি।
(যদি সম্ভব হয় মাছ/মাংস এক টুকরা)

*এছাড়াও কিশোরীদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আয়রন সমৃদ্ধ খাবার (যেমন: মুরগির কলিজা, ডাটা শাক, চেলা/মলা মাছ, লাল শাক ইত্যাদি) থাকা আবশ্যক।

মূলবার্তা:

- প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের উৎসমূহ, উপকারিতা ও অভাবজনিত সমস্যা সম্পর্কে জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করা উচিত।
- দেহের চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টিকর এবং সুষম খাবার গ্রহণ না করলে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয় না।

সেশন নং ৪

অপুষ্টিজনিত সমস্যা, প্রতিরোধ, প্রতিকার

রক্তস্বল্পতা, হাড়ের ক্ষয়, হাড় নরম হয়ে যাওয়া

নির্দেশনা -৭ সময়: ১৫ মিনিট

রক্তস্বল্পতা এবং রক্তস্বল্পতার লক্ষণগুলো কী কী? রক্তস্বল্পতার ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ ও প্রতিরোধের উপায়গুলো কী কী। অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয় কী ও লক্ষণ। অস্টিওম্যালেসিয়া বা হাড় নরম হয়ে যাওয়া কী ও লক্ষণ। এসকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট সম্পর্কে ধারণা দিন ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জানান।

লৌহ বা আয়রন এর অভাব (রক্তস্বল্পতা):

শরীরে লৌহ বা আয়রনের অভাবে রক্তস্বল্পতা হয়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকলে রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়। প্রয়োজনীয় খাবার, বিশেষ করে লৌহসমৃদ্ধ খাবারের অভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরা এই সমস্যায় বেশি ভুগে থাকে। ঘন ঘন গর্ভধারণের কারণেও কিশোরী ও মহিলারা রক্তস্বল্পতায় ভুগে থাকেন।

রক্তস্বল্পতার লক্ষণ

১. ঠোঁট, জিহবা, দাঁতের মাড়ি, হাতের তালু ও নখের গোড়া ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
২. বেশিক্ষণ বা বেশি কাজ করতে পারে না। দ্রুত ক্লান্তি চলে আসে।
৩. ঘনঘন শ্বাস নিতে থাকে, বুক ধড়ফড় (Palpitation) করে।

রক্তস্বল্পতার ফলে সমস্যাসমূহ

১. স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। পড়া মনে থাকে না। লেখাপড়ায় অমনোযোগ।
২. কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি চলে আসে।
৩. রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরি ব্যাহত হয়।
৪. গর্ভবতী মা রক্তস্বল্পতায় ভুগলে গর্ভের সন্তানেরও রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।
৫. নখ ভঙ্গুর ও ফ্যাকাসে হয়।

লৌহ ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের উপায়

১. পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা।
২. উদ্ভিজ্জ খাবারের সাথে ভিটামিন সি এবং প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাবার খাওয়া।
৩. খাওয়ার আগে ও পরে এক ঘণ্টার মধ্যে চা/কফি কিংবা ক্যাফেইন জাতীয় কিছু পান না করা।

অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয় (Osteoporosis)

ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি এর অভাবে হাড়ের ঘনত্ব এবং মান কমে যায়। হাড়ে ফাটল ধরা এবং ভেঙ্গে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ অবস্থাকে অস্টিওপোরোসিস বলা হয়। অস্টিওপোরোসিস বলতে বোঝায় সচ্ছিদ্র বা ঝাঁঝড়া হাড়।

অস্টিওপোরোসিসের লক্ষণ

১. পিঠে ব্যথা।
২. সময়ের সাথে সাথে উচ্চতা হ্রাস পাওয়া।
৩. সহজেই হাড় ভেঙ্গে যাওয়া বা ফাটল ধরা।

অস্টিওম্যালেসিয়া বা হাড় নরম হয়ে যাওয়া (Osteomalacia)

অস্টিওম্যালেসিয়ার অর্থ হচ্ছে হাড় নরম হয়ে যাওয়া। বয়স্ক নারীদের ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের অভাবে এই রোগ হয়ে থাকে। সচরাচর পুরুষদের চাইতে মহিলাদের এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়।

অস্টিওম্যালেসিয়ার লক্ষণ

১) অস্থি খুব নরম, ঝাঁঝরা ও সহজে ভঙ্গুর প্রকৃতির হয়।
২) পেলভিসের আকারের পরিবর্তন ঘটে।
৩) হাড় সহজেই ভেঙে যায়, বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং শারীরিকভাবে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তিদের।

ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ

কৈশোরকালে কাঁটাসহ ছোটমাছ, দুধ, দুধজাতীয় খাবার খেতে হবে। এসব খাবারে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। কোমল পানীয়ের পরিবর্তে দুধ এবং তাজা ফলের জুস খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। যেসব কিশোর-কিশোরীর দুগ্ধজাত খাবারে সহনশীলতা কম, তারা দুধের পরিবর্তে দই, পনির খেতে পারে। এসব খাবার দুধের তুলনায় সহজে হজম হয়।

ভিটামিন এ, বি কমপ্লেক্স, সি, ডি ও আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা

নির্দেশনা-৮ সময়: ২০ মিনিট

ভিটামিন এ, বি কমপ্লেক্স, সি, ডি ও আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা এবং এর অভাবে কী রোগ হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করুন। এর ফলে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধের বিষয়গুলো আলোচনায় যুক্ত করুন। সবশেষে সরকারি সেবাসমূহ সম্পর্কে ধারণা দিন। অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে টিকা প্রদান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করুন।

ভিটামিন এ এর অভাবজনিত সমস্যা:

ভিটামিন এ এর অভাবে,

১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর অভাবে ব্যক্তি ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়েন।
২. হজম ক্ষমতা হ্রাস পায়। প্রায়ই পেটের অসুখ হয়। ডায়রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়।
৩. ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তির অবনতি ঘটে। রাতকানা রোগ হয়।
৪. ত্বক খসখসে হয়। চুল লালচে হয়ে পড়ে এবং সহজেই পড়ে যায়।
৫. ঋতুস্রাব বা মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে অ্যানিমিয়া হতে পারে। এর ফলে অনিয়মিত মাসিক হতে পারে।

ভিটামিন এ-এর অভাবজনিত সমস্যার প্রতিরোধ:

১. কৈশোরে ভিটামিন এ-এর চাহিদা পূরণের জন্য ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। যেমন: গাঢ় সবুজ ও রঙিন শাকসবজি, হলুদ, সবুজ ও কমলা রঙের ফলমূল। সম্ভব হলে মাছ, ডিম, কলিজা, মাংস বার বার বেশি পরিমাণে খেতে হবে।
২. গাঢ় সবুজ শাকসবজি অবশ্যই পরিমাণ মত তেল দিয়ে রান্না করতে হবে। কারণ ভিটামিন-এ দেহে শোষণের জন্য তেলের প্রয়োজন হয়।
৩. কৈশোরে সকলকে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কে পুষ্টি শিক্ষা দিতে হবে।

ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এর অভাবজনিত সমস্যা:

ভিটামিন বি এর অভাবে,

১. দেহ কোষের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।
২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও স্মরণশক্তি কমে যায়।
৩. জিহ্বা ও ঠোঁটের কোণায় ঘা হয়।
৪. রক্তস্বল্পতা হয়। হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
৫. কর্মক্ষমতা কমে যায়। অল্পেই ক্লান্তি চলে আসে।
৬. বিভিন্ন স্নায়বিক রোগ দেখা দেয়। হাত পা ঝিম ঝিম করে।
৭. মুখে দানা (ব্রণ) ওঠে। ত্বক খসখসে হয়।

প্রতিরোধ:

১. অতি ছাঁটা আতপ চালের পরিবর্তে অল্প ছাঁটা ও আংশিক সিদ্ধ চাল খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
২. ভিটামিন বি কমপ্লেক্স শরীরে জমা থাকে না। তাই ভিটামিন বি কমপ্লেক্সসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেতে হবে।
৩. প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় শাকসবজি, দুধ, ডিম, মাছ বা মাংস, ডাল, ভুট্টা ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকতে হবে।

ভিটামিন সি এর অভাবজনিত সমস্যা:

ভিটামিন সি-এর এর অভাবে,

১. সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এর অভাবে ব্যক্তি ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়েন।
২. হাড় ও মাড়ি দুর্বল হয়ে যায়।
৩. হাড়ে ও হাত পায়ের গিটে ব্যথা হয়।
৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েদের হাড় গঠনে ব্যাঘাত ঘটে।
৫. অল্পতেই ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ হয়ে কালশিটা পড়ে। ক্ষত হলে সহজে সারে না।
৬. ভিটামিন সি এর অভাব হলে অ্যানিমিয়া হয়। শরীরে পানি জমে ফুলে যায়।
৭. হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
৮. স্কার্ভি নামক রোগ হয়। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হলো দাঁতের গোড়া ফুলে স্পঞ্জের মত হয়ে যাওয়া ও সেখান থেকে রক্তপড়া। দাঁত নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে, এমনকি দাঁত পড়েও যেতে পারে।

ভিটামিন সি এর অভাবজনিত সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার:

১. প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে টাটকা শাকসবজির প্রাধান্য থাকতে হবে। প্রতিদিনই কিছু পরিমাণে টক জাতীয় ফল খেতে হবে। সেইসাথে প্রতিদিন লেবু, বাতাবিলেবু, আমড়া, কাঁচা পেয়ারা, আমলকি ইত্যাদি মৌসুমি ফল খেতে হবে।
২. প্রয়োজন হলে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ভিটামিন ডি-এর অভাবজনিত সমস্যা:

ভিটামিন ডি-এর এর অভাবে,

১. হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত হয় না।
২. দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৩. রিকেট রোগ হয়।
৪. বিষণ্ণতায় ভোগা।
৫. ক্লান্তবোধ ও বেশি ঘুম পাওয়া।
৬. হাড় ও পেশির দুর্বলতা।

ভিটামিন ডি-এর অভাবজনিত সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার:

১. বিভিন্ন মাছে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ডি।
২. মাশরুমের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। মাশরুমে রয়েছে ভিটামিন ডি।
৩. ডিমে অল্প পরিমাণ ভিটামিন ডি রয়েছে। যাদের উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ কোলেস্টেরলে ভুগছেন তাদের ডিমের কুসুম খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে।

আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা:

আয়োডিনের ঘাটতির ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ,

১. স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়।
২. মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে।
৩. ত্রুটি নিয়ে শিশুর জন্ম।
৪. জন্মের পরপর শিশুর মৃত্যু।
৫. হাবাগোবা, বামনত্ব, বধির, টেরা।
৬. গলগণ্ড।
৭. গর্ভপাত।

আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যার প্রতিরোধ

যেহেতু দেহে বেশি পরিমাণ আয়োডিন সংরক্ষিত থাকে না, তাই নিয়মিত এবং অল্প পরিমাণ আয়োডিন গ্রহণ করতে হবে। খাবার লবণের মাধ্যমেই আয়োডিন গ্রহণ করা সহজ। প্রতিদিনই অল্প পরিমাণে আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে। রান্নার শেষের দিকে তরকারিতে লবণ দিতে হবে। তাহলে আয়োডিনের গুণমান অক্ষুণ্ন থাকে। এছাড়া, সামুদ্রিক মাছ খেয়েও আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করা যাবে।

আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার ও সংরক্ষণ

- রান্নার সময় শেষের দিকে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাবারে যোগ করতে হবে।
- লবণ কেনার সময় অবশ্যই আয়োডিনযুক্ত লবণের প্রতীক চিহ্ন দেখে নিতে হবে।
- আয়োডিনবিহীন বাজারের খোলা লবণ কেনা উচিত না।
- লবণ গলে গেলে তাতে আয়োডিন থাকে না।
- আয়োডিন উদ্বায়ী পদার্থ। তাই আয়োডিনযুক্ত লবণ সূর্য রশ্মি এবং চুলা থেকে দূরে ঢাকনাযুক্ত কাঁচের বোতল বা পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

লবণে আয়োডিনের উপস্থিতি যাচাই করার পরীক্ষা

- প্রথমে এক চা চামচ পরিমাণ লবণ নিন।
- একটি পরিষ্কার প্লেটে লবণ রাখুন।
- পাঁচটি ভাতের দানা নিন। লক্ষ্য রাখুন যেন পাঁচটির বেশি ভাতের দানা না হয়।
- লবণের সাথে ভাতের দানা ভালোভাবে চটকে নিন এবং প্লেটের মাঝখানে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন।
- লবণ মেশানো ভাতের উপর দুই ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। একটু পর যদি লবণের রঙ বেগুনি হয় তাহলে বুঝতে হবে লবণে আয়োডিন আছে।
- প্রতিবার লবণ কেনার পর উপরের নিয়মে পরীক্ষা করুন।

মূলবার্তাঃ

- অপুষ্টির কারণে শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়।
- কৈশোরকালীন অপুষ্টি প্রতিরোধে সুষম খাবার খেতে হবে।
- প্রতিদিন ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ আবশ্যক।

সেশন: ৫

কৈশোরকালীন বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ

এখানে দুইটি বিষয় নিয়ে ধারণা প্রদান করা হবে।

১. ঋতুস্রাব বা মাসিক সম্পর্কে।
২. স্বপ্নদোষ সম্পর্কে।

ঋতুস্রাব বা মাসিক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

নির্দেশনা-৯ সময়: ১৫ মিনিট

প্রদত্ত পোস্টার দেখিয়ে আলোচনা শুরু করুন। ঋতুস্রাব বা মাসিক কী ও কেন হয়, কীভাবে মেয়েরা গর্ভধারণ করে, ঋতুস্রাব বা মাসিক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আলোচনায় আনুন। এইসময় করণীয় ও ঋতুস্রাব বা মাসিক সম্পর্কিত ভুল ধারণাগুলো আলোচনায় যুক্ত করুন। আলোচনা শেষে এ সম্পর্কিত একটি নাটিকার আয়োজন করুন।

ঋতুস্রাব বা মাসিক কী?

কৈশোরে মেয়েদের ১০-১৪ বছর বয়স থেকে প্রতি মাসে জরায়ু থেকে যোনিপথে রক্তস্রাব বের হয়ে আসে, একে মাসিক বা ঋতুস্রাব বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিমাসেই মাসিক হয়ে থাকে। মাসিক ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

মেয়েদের প্রতি ২১ থেকে ৩৫ দিন অর্থাৎ গড়ে ২৮ দিন পর পর মাসিক হয়। একে মাসিকচক্র বলে। মাসিক শুরু হওয়ার দিন থেকেই মাসিকচক্র শুরু হয়। ৪৫-৪৯ বছর বয়সে স্বাভাবিক নিয়মেই মাসিক বন্ধ হয়ে যায়।

মাসিক বা ঋতুস্রাব মেয়েদের দেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার লক্ষণ। সাধারণত ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সে মাসিক শুরু হয়। তবে কারো কারো এর আগে বা পরেও হতে পারে। সাধারণত দেহে পুষ্টির ঘাটতি হলে মেয়েদের মাসিক দেরিতেও শুরু হতে পারে।

মাসিক কেন হয়?

মেয়েরা যখন বড় হয়, তখন প্রতি মাসে ডিম্বাশয় থেকে একটি ডিম্বাণু বের হয়ে ডিম্ববাহী নালীতে আসে। একই সময় জরায়ুতে রক্তে ভরা নরম পর্দা তৈরি হয়। যদি এ সময় যৌনমিলন হয় তাহলে শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণু মিলিত হয়ে ভ্রূণ তৈরি হয়। এই ভ্রূণ রক্তে ভরা নরম পর্দায় গিয়ে বসে এবং ধীরে ধীরে বড় হয়ে শিশুতে পরিণত হয়। যদি শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলন না হয়, তাহলে এই পর্দার আর প্রয়োজন হয় না। তখন এই রক্তে ভরা পর্দা ডিম্বাণুসহ মাসিক হিসেবে যোনিপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে ।

কীভাবে মেয়েরা গর্ভধারণ করে?

মাসিক সাধারণত ৪-৬ দিন থাকে এবং মাসিক শুরু হওয়ার দিন থেকেই মাসিক চক্র শুরু হয়। মাসিক হওয়ার ১০-১৮ দিনের মধ্যে যৌনমিলন হলে বাচ্চা হতে পারে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলে স্বামীর শুক্রাণু স্ত্রীর যোনিপথ দিয়ে জরায়ুতে ঢুকে। এই শুক্রাণু স্ত্রীর ডিম্বথলি (ওভারি) থেকে বের হয়ে আসা একটি জীবিত ডিম্বের সাথে মিলিত হলে ভ্রূণ তৈরি করে। এই ভ্রূণ জরায়ুতে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে বাচ্চা যোনিপথ দিয়ে বের হয়ে আসে। এভাবেই মেয়েরা গর্ভধারণ করে এবং সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ডিম্বাণু সাধারণত ৪৮ ঘন্টা এবং শুক্রাণু ৭২ ঘন্টা বেঁচে থাকে। তাই শুক্রাণুর সাথে ডিম্বানুর মিলন না হলে নির্দিষ্ট সময়ের পরে তা নষ্ট হয়ে যায়।

ঋতুস্রাব বা মাসিক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

১. এটি একটি স্বাভাবিক দৈহিক প্রক্রিয়া।
২. ঋতুস্রাব সাধারণত ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সে শুরু হয়।
৩. সাধারণত ২৮ দিন পরপর হয়। তবে কারো কারো ২১ দিন থেকে ৩৫ দিনের মধ্যেও হতে পারে। এর কোনটাই অস্বাভাবিক নয়।
৪. সাধারণত ৩-৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।
৫. ঋতুস্রাব চলাকালীন মেয়েরা অন্য সময়ের মত সব ধরনের কাজ করতে পারবে।
৬. এসময় সুষম খাবার বেশি খেতে হয়। বিশেষ করে আয়রন ও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার।

এ সময় করণীয়:

১. ঋতুস্রাব বা মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে ।
২. নিয়মিত গোসল করতে হবে ।
৩. দৈনিক কমপক্ষে ৩-৪ বার স্যানিটারি ন্যাপকিন বদলাতে হবে, যেন দেহে জীবাণু সংক্রমিত না হতে পারে।
৪. একটি স্যানিটারি ন্যাপকিন বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা উচিত নয়। বেশিক্ষণ ব্যবহার করা অস্বাস্থ্যকর। তাছাড়া, একটি ন্যাপকিন অনেক সময় ধরে ব্যবহার করলে, মাসিকের রক্ত পরনের কাপড় বা যেখানে সেখানে লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
৫. ন্যাপকিন সহজলভ্য না হলে কিংবা পাওয়া না গেলে পরিষ্কার তুলা বা কাপড় ব্যবহার করতে হবে। যদি কেউ কাপড় ব্যবহার করে বা করতে চায় তাহলে ব্যবহৃত কাপড়টি পরিষ্কার পানি ও সাবান বা ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। না হলে রোগ জীবাণুসহ পোকা-মাকড় বাসা বাঁধতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে ।
৬. স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের পরে তা কাগজের ব্যাগে মুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে ।
৭. প্রতিবার বাথরুম ব্যবহারের পরে ভালো করে সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।
৮. ঋতুস্রাব বন্ধ থাকলে। একমাসে ২/৩ বার মাসিক হলে। প্রচুর রক্তক্ষরণ বা প্রচন্ড ব্যথা হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
৯. ঋতুস্রাব শুরু হলে, মা বা পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের উচিৎ তাকে আশ্বস্ত করা বা বুঝিয়ে বলা।

ঋতুস্রাব বা মাসিক সম্পর্কিত কিছু ভুল ধারণা:

আমাদের সমাজে ঋতুস্রাব সম্পর্কিত কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন:

১. ঋতুস্রাব চলাকালে মেয়েরা দূষিত বা অপবিত্র হয়ে যায়।
২. এ সময়ে বাড়ি বা ঘরের বাইরে গেলে জ্বীন-ভূতে আছর করবে।
৩. এ সময়ে টক খাওয়া যাবে না, খেলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হবে।
৪. স্বামী বা শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে খাবার তুলে দেয়া যাবে না।
৫. এ সময়ে গোয়াল ঘরে যাওয়া যাবে না।
৬. চুল খোলা রেখে বসা যাবে না।
৭. বেশি চলাফেরা করা যাবে না।

স্বপ্নদোষ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

নির্দেশনা-৯ সময়: ১০ মিনিট

স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত কী এবং কেন হয়, স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ আলোচনা করুন। এ সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণা এবং কুসংস্কার নিয়ে বিস্তারিত জানান। ব্যক্তিগত ও যৌনাঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় কী কী করণীয় তা আলোচনায় রাখুন। অংশগ্রহণকারীদের কোন জিজ্ঞাসা থাকলে শুনুন ও উত্তর দিন।

স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত কী? কেন হয়?

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিক পরিবর্তনও ঘটে যার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক বিষয়, বিশেষ করে যৌনবিষয়ক কৌতুহল দেখা যায়। এ সময় হতেই ছেলেদের শুক্রাণু তৈরি হতে শুরু করে এবং ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হয়ে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনের প্রভাবে শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বীর্য তৈরি হয় এবং বীর্য থলিতে তা জমা হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের মধ্যে সাধারণত কোন উত্তেজনামূলক স্বপ্ন দেখলে বীর্য বের হয়ে আসে। একেই স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত বলা হয়। তবে, এর সাথে যৌন উত্তেজক স্বপ্নের সম্পর্ক থাকতে পারে, আবার নাও পারে।

স্বপ্নদোষ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এটি সবার জন্য এক রকম হয় না-কারো ক্ষেত্রে বেশি, কারো ক্ষেত্রে কম, আবার কারো ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। একটি ছেলে বড় হচ্ছে, স্বপ্নদোষ তারই লক্ষণ। যদিও এসময়ে কারো স্বপ্নদোষ না হওয়াও কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়।

স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

১. এটি বয়ঃসন্ধিকালের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।
২. সাধারণত ১২-১৩ বছর বয়স থেকে বীর্য তৈরি হতে শুরু হয়।

স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত সম্পর্কিত কিছু ভুল ধারণা :

১. খারাপ ছেলেদের স্বপ্নদোষ হয়।
২. স্বপ্নদোষ হলে স্বাস্থ্য খারাপ বা নষ্ট হয়ে যায়।
৩. স্বপ্নদোষ হলে যৌন ক্ষমতা কমে যায়।
৪. স্বপ্নদোষ একটি যৌন রোগ।

কিশোরদের ব্যক্তিগত ও যৌনাঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় করণীয়:

১. প্রতিদিন পরিষ্কার পানি দিয়ে যৌনাঙ্গ পরিষ্কার করতে হবে।
২. দিনে অন্তত একবার আন্ডারওয়্যার পরিবর্তন করতে হবে।
৩. কটনের (সুতি) আন্ডারওয়্যার পরিধান করতে হবে।
৪. সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে আন্ডারওয়্যার পরিষ্কার করতে হবে। ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।
৫. যৌনাঙ্গ বা মলদ্বারের ভিতর কোনো অপরিষ্কার বস্তু প্রবেশ করানো যাবে না।
৬. অপরিষ্কার হাতে কখনোই নিজের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা যাবে না।

মূলবার্তা:

- কৈশোরকালীন বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ খুবই স্বাভাবিক।
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলতে হবে।

সেশন: ৬

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইন ও কুফল

নির্দেশনা-১০ সময়: ১০ মিনিট

আলোচনার শুরুতে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করে নিন। এরপর বাল্যবিবাহের পরিণতি ও কুফল, অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও শাস্তি নিয়ে বিস্তারিত জানান। বাল্যবিবাহ রোধে কীভাবে ভূমিকা রাখা যাবে, সে বিষয়ে আলোচনা করুন। বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে বাস্তবের সাথে সম্পর্কে আছে এমন একটি গল্প বলুন।

বিয়ের শর্ত: বয়স, সম্মতি, সাক্ষী, রেজিস্ট্রেশন

বয়স: বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিয়ের জন্য মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে।
সম্মতি: বিয়ের দ্বিতীয় শর্ত হল ছেলে ও মেয়ে দুজনের সম্মতি থাকতে হবে। এ সম্মতি স্বেচ্ছায় দিতে হবে, জোরপূর্বক নয়। জোরপূর্বক সম্মতি আদায় করলে বিয়েটি অবৈধ বলে গণ্য হবে।
রেজিস্ট্রেশন: অবশ্যই বিয়ের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।

বাল্য বিবাহ কি?

আইন অনুযায়ী নির্ধারিত বয়সসীমার কম বয়সে বিয়ে হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিয়ের জন্য মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে। এর চেয়ে কম বয়েসি ছেলে-মেয়ের বিয়ে হলে তা বৈধ বলে গন্য হবে না। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এ ধরনের বিয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
বাংলাদেশে কিশোরীদের বাল্যবিবাহ দেওয়ার প্রবণতা ব্যাপকভাবে দেখা যায়। বাংলাদেশে ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ্ সার্ভে ২০১৪ অনুযায়ী, ২০-২৪ বছর বয়েসি বিবাহিত ৫৯ শতাংশ মেয়েদের বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের মধ্যে এবং ১৫-১৯ বছর বয়েসি ৩১ শতাংশ কিশোরী গর্ভবতী হয়েছে।

বাল্যবিবাহের পরিণতি

বাল্যবিবাহের ফলে কৈশোরকালীন ক্ষতিগুলো:

শারীরিক ক্ষতি	মানসিক ক্ষতি	সামাজিক ক্ষতি
১. ২০ বছর বয়সের আগে মেয়েদের শরীর সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয় না। মেয়েদের দেহের পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই সন্তান ধারণ করলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি	১. মানসিক পরিপক্কতা ও বোঝার ক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।	১. কম বয়সে বিয়ে হলে কিশোর-কিশোরীদের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে। অনেক সময় পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়।

বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেক্ষেত্রে মা ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে।		
২. অল্প বয়সে মা হলে মেয়েদের শরীরে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।	২. কৈশোরকালে কিশোর-কিশোরীর মানসিক গঠন কাল। এসময়ে তার নিজের মানসিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয় না, তার ওপর তারা মা-বাবা হলে অতিরিক্ত চাপ নিতে পারে না। ফলে, মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।	২. বাল্য বিবাহের ফলে কিশোর-কিশোরীদের পড়াশোনার হার কমে যায়। তারা উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।
৩. কিশোরীদের নানা রকম শারীরিক জটিলতার দেখা দেয়। এতে মৃত্যুও হতে পারে।	৩. অল্প বয়সে মা হলে সংসারের দায়-দায়িত্ব নিতে হয়। এর ফলে তারা লেখাপড়া করতে পারে না। প্রতিভা বিকাশের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।	৩. অনেক সময় অল্প বয়সের মেয়েরা স্বামী/শ্বশুর বাড়ির নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ি চলে আসে। তখন সমাজ মেয়েটিকে নেতিবাচকভাবে দেখে।
৪. অপুষ্ট ও রুগ্ন শিশুর জন্ম হয়।	৪. দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।	৪. কিশোর-কিশোরীরা ভবিষ্যতে আয় রোজগার করতে পারে না।
৫. শিশু মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হয়।	৫. মানসিক চাপ বাড়ে।	৫. কিশোরদের ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং সংসারের প্রতি অবহেলা দেখা দেয়।
৬. মায়ের সন্তান লালন পালনে কষ্ট হয়।	৭. কিশোর-কিশোরীরা তাদের আনন্দ বা বিনোদন থেকে বঞ্চিত হয়।	৭. অনেক সময় পারিবারিক বিরোধের জন্ম নেয়।

অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ:

এ সময়ে সৃষ্ট সমস্যাগুলো হলো-

১. প্রসবে জটিলতা।

২. কম ওজন বিশিষ্ট শিশুর জন্ম হয়।

৩. রক্তস্বল্পতা।

৪. প্রসব পরবর্তী অবসাদ।

৫. নবজাতক মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু।

৬. গর্ভপাত।

৭. মাতৃমৃত্যু ইত্যাদি।

বাল্যবিবাহের আইন ও শাস্তি:

১. দেশে বাল্যবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়েসি মেয়ে ও ২১ বছরের কম বয়েসি ছেলেকে নাবালক বলা হয়। শিশু বা নাবালকের বিয়ে আইনত দণ্ডনীয়।

২. ২১ বছর বয়সের কম কোন পুরুষ, ১৮ বছরের কম কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না।

৩. প্রাপ্তবয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৪. অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হবেন।

৫. কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করলে তাকে অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৬. কোন বিবাহ নিবন্ধক বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। এজন্য তাকে অনধিক ২ (দুই) বছর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং তার লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল করা হবে। যে বাবা-মা নাবালক ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেবেন তাদের ক্ষেত্রেও একই শাস্তি প্রযোজ্য।

৭. এছাড়া, কোথাও বাল্যবিবাহের আয়োজন হলে যে কেউ আদালতে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

মূলবার্তা:

- বাল্যবিবাহ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।
- বাল্যবিবাহে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতি হয়।
- বাল্যবিবাহের বিপক্ষে জনগণের সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।

সেশন: ৭

গর্ভকালীন পুষ্টি ও যত্ন

নির্দেশনা-১২ সময়: ২০ মিনিট

গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের কতটুকু ধারণা আছে তা জানার চেষ্টা করুন। গর্ভবতী মায়ের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োজনীয়তাগুলো কী কী, গর্ভাবস্থায় পুষ্টির চাহিদা কেমন থাকে, গর্ভবতী মায়েদের গর্ভাবস্থায় খাদ্য নির্বাচন কেমন হওয়া উচিত এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিষয়ে সচেতনতা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বিস্তারিত জানান। গর্ভবতী মায়ের নমুনা খাদ্য তালিকা তৈরি নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রদত্ত ফ্লিপ চার্টে আলোচিত বিষয়গুলো প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করুন।

গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি:

গর্ভধারণ ও সন্তান পালন সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর একটি স্বাভাবিক কাজ। সন্তান যখন মায়ের দেহ থেকে পুষ্টি উপাদান নিয়ে ক্রমে নিজের দেহ গঠন করে তখন মায়ের অতিরিক্ত পুষ্টি চাহিদার প্রয়োজন হয়।
মায়ের গ্রহণ করা খাবারে যদি তার নিজের ও সন্তানের চাহিদা পূরণের উপযুক্ত পুষ্টি উপাদান না থাকে তবে মায়ের শরীর ক্ষয় হয়ে, শিশুর প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা চলে। এমন অবস্থায় মা ও শিশু উভয়েই পুষ্টিহীনতার শিকার হয়। মায়ের নিজের দেহের গঠন যদি সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, তখন গর্ভবতী হলে নিজের ও সন্তানের দেহ গঠনের চাহিদা এই দুই অতিরিক্ত চাহিদার কারণে মায়ের শারীরিক ও মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এ সময় মায়ের পুষ্টি উপাদানের অভাব তীব্র হলে শিশু মায়ের শরীর থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি পায় না। ফলে অপরিণত, বিকলাঙ্গ এমনকি মৃত সন্তানও ভূমিষ্ঠ হতে পারে। সুতরাং গর্ভধারণকাল ও স্তন্যদানকাল এই দুই সময় মায়ের জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

যেসকল কারণে গর্ভবতী মায়ের জন্য অতিরিক্ত পুষ্টিসম্মত খাদ্য প্রয়োজন:

১. গর্ভস্থ শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য।
২. মা ও গর্ভের শিশু সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য।
৩. ভূমিষ্ঠ সন্তানের চাহিদা মাফিক মায়ের বুকের দুধ তৈরির জন্য।

গর্ভাবস্থায় পুষ্টির চাহিদা:

বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে দরিদ্র ও পুষ্টিহীন মায়েরা যে সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের ওজন কম হয়, বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয় এবং পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। অনেক সময় মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে, গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ না করলেও, মা নিজের দেহ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে গর্ভের শিশুকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এই সকল ক্ষেত্রে মায়ের দেহে যে ক্ষয় হয়, তা পরবর্তীতে খুব দ্রুত পূরণ হওয়া দরকার। না হলে মায়ের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন দেহ নানারকম রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মা যদি গর্ভধারণের সময়ে যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী না থাকেন অথবা, নিজের বাড়ন্ত বয়সের কারণে নিজের শরীরের বাড়তি চাহিদা পূরণে অক্ষম থাকেন, তখন গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত খাদ্য উপাদান না পেলে শিশুকে উপযুক্ত পুষ্টি সরবরাহ করতে পারেন না। ফলে জন্ম নেয়া এসব শিশু শুধু যে কম ওজনের দেহ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয় শুধু তাই নয়, অপরিণত কম ওজনের মস্তিষ্ক নিয়েও জন্মগ্রহণ করতে পারে। এসকল কারণে গর্ভাবস্থায় পুষ্টিসম্মত খাদ্য গ্রহণ খুবই জরুরি।

গর্ভবতী মায়েদের গর্ভাবস্থায় করণীয়:

ক) গর্ভবতী মায়েদের নিজের খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে

খাদ্য নির্বাচন:

গর্ভবতী মায়ের ওজন ও গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সামগ্রিক পুষ্টি চাহিদা (যেমন: শর্করা, আমিষ, তেল এবং প্রধান অণুপুষ্টি উপাদান) পূরণের লক্ষ্যে, আদর্শ খাদ্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন খাদ্য শ্রেণি থেকে খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। একটি পর্যাপ্ত এবং উন্নতমানের সুষম খাবার প্রস্তুত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে পরামর্শকৃত ৭টি খাদ্য শ্রেণির মধ্যে কমপক্ষে ৪টি বা তার বেশি খাদ্য শ্রেণি থেকে খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এই ৭টি খাদ্য নিম্নে দেওয়া হল-

১. শস্য ও শস্যজাত খাবার, মূল ও কন্দ।

২. প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাবার যেমন: মাছ, গরু/খাসির মাংস, কলিজা, ডিম ইত্যাদি।

৩. ডাল, বীজ ও বাদাম জাতীয় খাবার।

৪. দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার, যেমন: দই, পনির ইত্যাদি।

৫. ভিটামিন এ জাতীয় ফল ও সবজি।

৬. অন্যান্য ফল ও সবজি।

৭. তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত ৭টি খাদ্য শ্রেণির মধ্যে কমপক্ষে ৪টি খাদ্য শ্রেণি ব্যবহার করে সুষম খাবার তৈরি করতে হবে। তাহলে তা অধিক পুষ্টিকর এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। বিভিন্ন খাবারের সঠিক মিশ্রণ খাবারে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের শোষণে সহায়তা করে (যেমন খাবারে তেল বা চর্বি যোগ করলে তা খাবারে বিদ্যমান চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন: এ, ডি, ই এবং কে এর শোষণ বৃদ্ধি করে)।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

১. পেয়ারা, লেবু, কমলা, আমলকি, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা, আমড়া, জলপাই ইত্যাদি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলমূলের যেকোন এক প্রকার ফল প্রতিদিন অবশ্যই খেতে হবে।

২. গাঢ় সবুজ শাক, লাল শাক, সজনে শাকের যেকোন এক প্রকার অবশ্যই প্রতিদিন খাবারের তালিকায় রাখতে হবে। রান্নায় পরিমাণমতো খাবারের তেল ব্যবহার করতে হবে।

৩. এছাড়া কাঁটাসহ মাছ, এক গ্লাস/এক কাপ দুধ প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে ৩-৪ দিন খেতে হবে।

৪. রান্নায় অবশ্যই আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করতে হবে।

৫. বাদাম, শিম, বীজ জাতীয় খাবার, মাছ বা ডিম অন্তত যেকোন একটি প্রতিদিন খেতে হবে।

খ) নিয়মিত গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা (ANC) করতে হবে

গর্ভাবস্থায় অন্তত ৪ বার গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে (মায়ের ওজন, রক্তস্বল্পতা, রক্তচাপ, গর্ভে শিশুর অবস্থান পরীক্ষা করা)

১ম স্বাস্থ্য পরীক্ষা	১৬ সপ্তাহে (৪ মাস)
২য় স্বাস্থ্য পরীক্ষা	২৪-২৮ সপ্তাহে (৬-৭ মাস)
৩য় স্বাস্থ্য পরীক্ষা	৩২ সপ্তাহে (৮ মাস)
৪র্থ স্বাস্থ্য পরীক্ষা	৩৬ সপ্তাহে (৯ মাস)

যথাযথ খাবার/পুষ্টির অভাব যেভাবে বোঝা যাবে:

- মা দুর্বল বোধ করবেন, অল্পেই ক্লান্ত হয়ে যাবেন।
- মা বেশি কাজ করতে পারবেন না।
- শিশু মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে যথাযথ পুষ্টি গ্রহণ করতে না পারলে, প্রথমে তার বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবে, ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে।

গর্ভকালীন যত্ন:

১. গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বেশি খাবার বারে বারে খেতে হবে।

২. প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

৩. গর্ভাবস্থা নিশ্চিত হবার সাথে সাথে প্রতিদিন রাতের খাবারের পরপরই ১টি করে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খেতে হবে। প্রসব পরবর্তী তিন মাস ট্যাবলেটটি সেবন করতে হবে।

৪. গর্ভাবস্থায় তিন মাসের পর থেকে প্রতিদিন সকালে একটি এবং দুপুরে একটি করে মোট দুইটি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ভরা পেটে খেতে হবে। প্রসব পরর্বতী তিন মাস ট্যাবলেটটি সেবন করতে হবে।

৫. আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে।

৬. গর্ভাবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম (দুপুরে খাবারের পর ২ ঘন্টা এবং রাতে ৮ ঘন্টা) নিতে হবে।

৭. গর্ভবতী মহিলাকে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তিতে রাখতে হবে। এতে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকবে।

৮. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

৯. ভারী কাজ (যেমন: টিউবওয়েল থেকে পানি তোলা, ধান ভানা, ভারী জিনিস তোলা, অতিরিক্ত কাপড় ধোয়া) এবং কষ্টকর পরিশ্রম থেকে বিরত থাকতে হবে।

গর্ভবতী মায়ের নমুনা খাদ্য তালিকা :

ক্রমিক	খাদ্যের নাম	পরিমাণ (রান্না করা)	ওজন (গ্রাম)	ক্যালরি (কি.ক্যালরি)
সকালের নাস্তা				
১.	রুটি/ব্রেড	৩টি (মাঝারি)	৩×৩২	২০০
২.	ডিম	১টি	৪০	৬২
৩.	সবজি (শিম, কুমড়া ইত্যাদি)	২.৫ বাটি	৪৫০	১৫১
দুপুরের আগের ভোজ				
৪.	ফল (কলা, আমড়া ইত্যাদি)	১টি (মাঝারি)	৬০	৩৯
৫.	দুধ দিয়ে তৈরি খাবার	১ বাটি	১৬০	১৫৮
দুপুরের ভোজ				
৬.	ভাত	৩ বাটি	৪৫০	৪৮৫
৭.	ডাল	১ বাটি (ঘন)	১৫০	১২৩
৮.	শাক (লাল শাক, কচু শাক ইত্যাদি)	১/২ বাটি	৯০	৩৫
৯.	মাছ/মাংস	১ টুকরা	৪০	৬০
বিকালের নাস্তা				
১০.	বিস্কুট	২টি	১৫	৭৫
১১.	কলা/আম (পাকা)	১ টি (মাঝারি)	১৮০	১৭১
রাতের খাবার				
১২.	ভাত	২ বাটি	৩০০	৩২৩
১৩.	ডাল	১ বাটি (ঘন)	১৫০	১৭১
১৪.	মাছ/মাংস	১ টুকরা	৪০	৬০
রাতে ঘুমানো আগে				
১৫.	দুধ	১ গ্লাস	২৫০	১৬৩
দৈনিক ব্যবহারিত তেল				
১৬.	ভোজ্য তেল	৫ চা চামচ	২৫	২১৮
	মোট			২৪৪৭

মূলবার্তা:

- গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টি চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অতিরিক্ত খাবারের প্রয়োজন হয়।
- গর্ভবতী মায়ের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।
- গর্ভবতী মায়ের যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম ও সঠিক যত্ন নিতে হবে।

সেশন: ৮

প্রসব পরবর্তী পুষ্টি ও যত্ন

নির্দেশনা-১৩ সময়: ২০ মিনিট

প্রসূতি মায়ের পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন। স্তন্যদানকালে মায়ের অতিরিক্ত পুষ্টি চাহিদার কারণ, স্তন্যদানকারী মায়েদের দুগ্ধদানকালে করণীয় কী, প্রসূতি মায়ের নমুনা খাবারের তালিকা কেমন হওয়া উচিত, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের সহযোগিতার জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের করণীয় কী হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনার সময় প্রদত্ত ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শন করুন।

প্রসূতি মায়ের পুষ্টি:

প্রসব পরবর্তী সেবা নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের একটি অপরিহার্য অংশ। প্রসবের পর থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে 'প্রসবোত্তরকাল' বলা হয়। এ সময় মায়ের বিশেষ সেবা প্রয়োজন। কারণ এ সময় শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়ের শরীরে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। শিশুর বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান মায়ের দুধে বিদ্যমান, যা শিশু মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এমন অবস্থায় মায়ের শরীর সুস্থ রাখার জন্য সব ধরনের পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ বাড়তি খাবার এবং বাড়তি যত্নের প্রয়োজন।

স্তন্যদানকালে মায়ের পুষ্টি চাহিদা:

স্তন্যদানকালে মায়ের খাদ্য উপাদানের চাহিদা, বিশেষ করে ক্যালরি, প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিনের চাহিদা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। নিচে এর কারণ দেয়া হল:

১. মায়ের বুকে যে দুধ তৈরি হয়, তাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মানের প্রোটিন, ক্যালরি ও ভিটামিন। যা শিশুর জন্য খুবই জরুরি।
২. প্রসূতিকালে মায়েদের পুষ্টির চাহিদা গর্ভকালীন সময়ের চেয়ে বেশি থাকে। মায়ের নিজের দেহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেই সাথে দুধ নিঃসরণ করার শক্তির জন্য এই বাড়তি পুষ্টি চাহিদার প্রয়োজন হয়।

স্তন্যদানকারী মায়েদের স্তন্যদানকালে করণীয়:

ক) স্তন্যদানকারী মায়েদের নিজের খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে

খাদ্য নির্বাচন:

স্তন্যদানকারী মায়ের সামগ্রিক পুষ্টি চাহিদা ও শিশুকে পর্যাপ্ত দুধ পান করানোর জন্য আদর্শ খাদ্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতে বিভিন্ন খাদ্য শ্রেণি থেকে খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

একটি পর্যাপ্ত এবং উন্নতমানের সুষম খাবার প্রস্তুত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে পরামর্শকৃত ৭টি খাদ্য শ্রেণির মধ্যে কমপক্ষে ৪টি বা তার বেশি খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এই ৭টি খাদ্য শ্রেণি নিম্নে দেওয়া হল,

১. শস্য ও শস্যজাত খাবার, মূল এবং কন্দ।
২. প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাবার যেমন: মাছ, গরু/খাসির মাংস, কলিজা, ডিম ইত্যাদি।
৩. ডাল, বীজ ও বাদাম জাতীয় খাবার।
৪. দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার, যেমন: দই, পনির ইত্যাদি।

৫. ভিটামিন এ জাতীয় ফল ও সবজি।
৬. অন্যান্য ফল ও সবজি।
৭. তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত ৭টি খাদ্য শ্রেণির মধ্যে কমপক্ষে ৪টি ব্যবহার করে সুষম খাবার তৈরি করা হলে তা অধিক পুষ্টিকর এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। বিভিন্ন খাবারের সঠিক মিশ্রণ খাবারে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান শোষণে সহায়তা করে, যেমন: খাবারে তেল বা চর্বি যোগ করলে তা খাবারে বিদ্যমান চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো, যেমন: এ, ডি, ই এবং কে এর শোষণ বৃদ্ধি করে)।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়

১. স্তন্যদানের সময় সকল পুষ্টি উপাদানের অতিরিক্ত চাহিদার কারণে প্রায় সকল খাদ্যই পরিমাণে বাড়াতে হয়। অতিরিক্ত প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বলে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ খাদ্য তালিকায় অবশ্যই থাকতে হবে।
২. প্রসূতি মায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাবারের একটি হল দুধ। প্রতিদিন কেবল আধ লিটার দুধ পান করলেই মায়ের অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনের চাহিদার প্রায় সবটুকু এবং ক্যালরি ও ভিটামিনের অধিকাংশই পূরণ হয়। এর সাথে খাদ্যশস্য ডাল ও সকল খাদ্যবস্তু পরিমাণে কিছু কিছু বাড়ালে বাকি ক্যালরি ও খণিজ লবণের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ হবে।
৩. ভিটামিন সি এর চাহিদা পূরণের জন্য প্রচুর ফলমূল ও শাকসবজি খেতে হবে।
৪. প্রসূতি মায়ের ঘন ঘন পিপাসা পায়। কারণ মায়ের বুকের দুধ তৈরিতে দেহে প্রচুর পানির প্রয়োজন। দুধ ও ফল এই পানির প্রয়োজন কিছুটা লাঘব করলেও, প্রচুর পানি পান করা দরকার।
৫. স্তন্যদানের সময় অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে যেন মায়ের ওজন বৃদ্ধি না পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সময় স্বাভাবিক নিয়মে গর্ভধারণকালে সঞ্চিত মেদ ধীরে ধীরে কমে আসবে। যেসব মা শিশুকে দুধ খাওয়াতে সক্ষম হচ্ছেন না তিনি যদি সাধারণ মহিলার চাইতে বেশি আহার করেন, তাহলে ওজন বৃদ্ধি পাবে এবং অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।
৬. কোন কোন ওষুধ, মাদক কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি গ্রহণ করলে সেগুলো দুধ দ্বারা নিঃসৃত হয়ে শিশুর শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তা অনেকসময় শিশুর জন্য বিপদজনক হতে পারে। তাই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় ওষুধ গ্রহণের সময় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। দুগ্ধদানকারী মায়ের সকল ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য পরিহার করতে হবে।

মায়ের দুধ উৎপাদন সহায়ক নিচের বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে:

১. প্রসূতি মাকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসম্মত তরল পান করতে হবে।
২. উচ্চমানের প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।
৩. পর্যাপ্ত ক্যালরি গ্রহণ করতে হবে।
৪. মাকে সবরকম দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে হবে। আনন্দচিত্তে শিশুকে লালন পালন করতে হবে।
৫. প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে হবে।
৬. ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

খ) নিয়মিত প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা (PNC) করাতে হবে

শিশু জন্মের পর অন্তত ৪ বার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।

১ম স্বাস্থ্য পরীক্ষা	**২৪ ঘন্টায় মধ্যে।**
২য় স্বাস্থ্য পরীক্ষা	প্রসবের ২-৩ দিনের মধ্যে।
৩য় স্বাস্থ্য পরীক্ষা	প্রসবের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ।
৪র্থ স্বাস্থ্য পরীক্ষা	প্রসবের ৪২-৪৫ দিনের মধ্যে।

প্রসব পরবর্তী সেবা:

১. শিশুর জন্মের ৪২ দিনের মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব মাকে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন (২ লক্ষ ইউনিট) ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।
২. প্রসবের পর ৩ মাস পর্যন্ত একটি করে আয়রন ফলিক এসিড এবং ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট প্রতিদিন ভরা পেটে খেতে হবে।
৩. প্রসূতি মায়েদের যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম নিতে হবে।
৪. প্রসূতিকে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তিতে রাখতে হবে।
৫. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য নমুনা খাদ্য:

গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের শক্তির চাহিদা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকে। এ সময়ের শক্তি ও অনুপুষ্টির অতিরিক্ত চাহিদা পূরণে আমরা নিম্নোক্ত খিচুড়ি মাকে দিতে পারি।

খিচুড়ি ফর্মূলা:

মোট শক্তিমূল্য= ৭৬২ কি. ক্যালরি
আমিষের পরিমাণ= ২১ গ্রাম
দিনের মধ্যে ৩-৫ বার এই খিচুড়ি খাওয়াতে হবে।

উপাদান	পরিমাণ
চাল	২ মুঠ (৬০ গ্রাম)
ডাল	১ মুঠ (২৫ গ্রাম)
তেল	৮ টেবিল চামচ (৩২ গ্রাম)
ডিম/মাংস/মাছ	১ পিস (৫৫ গ্রাম)
হলুদ, সবুজ ও কমলা রঙের শাকসবজি	১ মুঠ (৩৫ গ্রাম)
ক্যালরি	৭৬২ কিলোক্যালরি
আমিষ	২১ গ্রাম

প্রসূতি মায়ের নমুনা খাবারের তালিকা:

ক্রমিক	খাদ্যের নাম	পরিমাণ (রান্না করা)	ওজন (গ্রাম)	ক্যালরি (কি.ক্যালরি)
সকালের নাস্তা				
১.	রুটি/ব্রেড	৩টি (মাঝারি)	৩×৩২	২০০
২.	ডিম	১টি	৪০	৬২
৩.	সবজি (শিম, কুমড়া ইত্যাদি)	২.৫ বাটি	৪৫০	১৫১
দুপুরের আগের ভোজ				
৪.	ফল (পেয়ারা, আমড়া ১টি (মাঝারি)	১টি	৬০	৩৯
৫.	দুধ দিয়ে তৈরি খাবার	১ বাটি	১৬০	১৫৮
দুপুরের ভোজ				
৬.	ভাত	৩ বাটি	৪৫০	৪৮৫
৭.	ডাল	১.৫ বাটি (হালকা ঘন)	২২৫	১২৩
৮.	শাক (লাল শাক, কচু শাক বাটি ইত্যাদি)	১/২ বাটি	৯০	৩৫
৯.	মাছ/মাংস	১ টুকরা (বড়)	৪০	৬০
বিকালের নাস্তা				
১০.	বিস্কুট	২টি	১৫	৭৫
১১.	কলা/আম (পাকা)	১ টি (মাঝারি)	১৮০	১৭১
রাতের খাবার				
১২.	ভাত	৩ বাটি	৪৫০	৪৮৫
১৩.	ডাল	১.৫ বাটি (হালকা ঘন)	২২৫	১৩২
১৪.	মাছ/মাংস	১ টুকরা (বড়)	৪০	৬০
রাতে ঘুমানো আগে				
১৫.	দুধ	১ গ্লাস	২৫০	১৬৩
দৈনিক ব্যবহারিত তেল				
১৬.	ভোজ্য তেল	৫ চা চামচ	২৫	২১৮
	মোট			২৬২৬

সূত্র: ফুড কম্পোজিশন টেবিল এন্ড ডাটাবেইজ ফর বাংলাদেশ উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু সিলেক্টেট এথনিক ফুডস, আইএনএফএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের সহযোগিতার জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের (মা, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ, অন্যান্য আত্মীয়) করণীয়:

- গর্ভকালীন সেবা গ্রহণের জন্য গর্ভবতী মহিলার সাথে সেবা কেন্দ্রে যাওয়া এবং আয়রন ফলিক এসিড খাওয়ার জন্য গর্ভবতী মহিলাকে মনে করিয়ে দেয়া।
- গর্ভবতী মহিলা/দুগ্ধদানকারী মাকে বার বার খাবার খেতে উৎসাহিত করা।
- ঘরের দৈনন্দিন টুকিটাকি কাজে গর্ভবতী মহিলাকে সাহায্য করে তার কাজের চাপ কমানো।
- হাসপাতালে প্রসব করানোর বিষয়ে গর্ভবতী মহিলাকে উৎসাহিত করা এবং সহযোগিতা করা।
- হাসপাতালে প্রসবের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থার প্রস্তুতি নেয়া।
- জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের বুকের দুধ (শালদুধ) খাওয়ানোর জন্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মাকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা এবং শালদুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করা।
- মা যেন শিশুকে যথেষ্ট সময় নিয়ে এবং সঠিক নিয়মে (position & attachment) দুধ খাওয়াতে পারেন তার জন্য দুগ্ধদানকারী মাকে সুযোগ করে দেয়া।

মূলবার্তা:

- স্তন্যদানকালে মায়ের খাদ্য চাহিদা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়।
- নিয়মিত প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা (PNC) করাতে হবে।
- পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতামূলক আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সেশন: ৯

নবজাতকের প্রতি করণীয়

নির্দেশনা-১৪ সময়: ১০ মিনিট

নবজাতকের যত্ন কী? নবজাতকের মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো কী? নবজাতকের বিপদ চিহ্নসমূহ কী কী? তা নিয়ে আলোচনা করুন। নবজাতকের মৃত্যু প্রতিরোধে ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা কেমন হওয়া উচিত, নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন। আলোচনার সাথে ফ্লিপ চার্টে আলোচিত বিষয়গুলো প্রদর্শন করুন।

নবজাতকের যত্ন:

শিশুর জন্মের পর থেকে পরবর্তী ২৮ দিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয়, প্রতিরোধমূলক ও নিরাপদ পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে নবজাতকের যত্ন বলা হয়। এ সময়ের যত্ন শিশুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের স্বাস্থ্যের সাথে নবজাতকের জীবনরক্ষার বিষয়টি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই প্রসব পরবর্তী কয়েকটি ঘণ্টা এবং প্রথম কয়েকটি দিন মা ও শিশুর বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন।

নবজাতকের মৃত্যু:

জন্মের পর ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুকে নবজাতক বলা হয়। এই সময়ের মধ্যে শিশুর মৃত্যু হলে তাকে নবজাতকের মৃত্যু বলা হয়।

নবজাতকের মৃত্যুর প্রধান কারণ:

১. অপরিণত জন্মজনিত জটিলতা ও কম জন্ম-ওজনের শিশু।
২. জন্মকালীন শ্বাসরুদ্ধতা।
৩. মারাত্মক সংক্রমণ (সেপসিস) ইত্যাদি।

নবজাতকের বিপদ চিহ্নসমূহ:

১. মায়ের দুধ খেতে না পারা বা না চোষা।
২. খিঁচুনি।
৩. শান্ত অবস্থায় দ্রুত শ্বাস নেওয়া (মিনিটে ৬০ কিংবা তার চেয়ে বেশি বার)
৪. বুকের খাঁচার নিচের অংশ মারাত্মকভাবে বসে যাওয়া।
৫. শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া বা জ্বর (৩৭.৫° সে. বা ৯৯.৫° ফা. এর বেশি)।
৬. শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া বা হাইপোথার্মিয়া (৩৫.৫° সে. বা ৯৫.৯° ফা. এর কম)।
৭. নেতিয়ে পড়া বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম নড়াচড়া করা (উদ্দীপ্ত করা ছাড়া অথবা একেবারেই নড়াচড়া করে না)।

নবজাতকের মৃত্যু প্রতিরোধে ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

১. নবজাতক জন্মের পর নাড়ি কাটার পরপরই নাভির কাটা অংশে ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন দ্রবণ লাগানো।
২. কম ওজন বিশিষ্ট নবজাতকের জন্য ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার দেওয়া। সময়ের আগে জন্ম নেওয়া ও কম ওজনের শিশুকে ক্যাঙ্গারু পদ্ধতিতে বুকের ওপর চামড়ার সঙ্গে মিশিয়ে রেখে সুস্থ করে তুলতে পারে প্রসূতি মা। এ পদ্ধতিতে মায়ের ত্বকের সঙ্গে শিশুটির ত্বকের সংস্পর্শ ঘটাতে হয়। অপরিণত নবজাতকের শরীরে তাপমাত্রা কম থাকার ফলে শিশুর মৃত্যুঝুঁকি থাকে। এ পদ্ধতিতে মা নবজাতককে বুকে জড়িয়ে রাখলে, তার শরীরের তাপমাত্রা নবজাতকের শরীরে প্রবাহিত হয়। তখন শিশুটি মায়ের দেহের তাপেই গরম অনুভব করে। এটি ইনকিউবেটরের বিকল্প হিসেবে কাজ করে, যাতে মৃত্যুঝুঁকি কমে যায়।
৩. কোন নবজাতক সেপসিসে (মারাত্মক সংক্রমণ) আক্রান্ত হলে চিকিৎসকের নিকট নিয়ে যাওয়া।
৪. অপরিণত (Premature) নবজাতকের জন্ম হলে শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া।

নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় পরিচর্যা

- **মুছানো:** জন্মের সাথে সাথে পরিষ্কার ও শুকনো নরম সুতি কাপড় দিয়ে মুছে দেয়া।
- **নাড়ির যত্ন:** জীবাণুমুক্ত উপায়ে নাড়ি কেটে বেঁধে রাখা ও নাড়ি শুকনো রাখা।
- **উষ্ণতা বজায় রাখা:** নবজাতকের শরীর মুছে দেয়ার সাথে সাথে মায়ের শরীরের সংস্পর্শে নিয়ে আসা। পরবর্তীতে মাথা ও শরীর কাপড়ে জড়িয়ে উষ্ণ রাখা।
- **মায়ের দুধ খাওয়ানো:** জন্মের সাথে সাথে, অবশ্যই এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ (শালদুধ) খাওয়ানো।
- **গোসল না করানো:** জন্মের ৩ দিনের মধ্যে কোনভাবেই শিশুকে গোসল করানো যাবে না।
- **চোখের যত্ন:** স্বাভাবিক অবস্থায় চোখে কিছু না দেওয়া বা চোখ না মোছা।

নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা

নবজাতকের জীবনরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলোই হল নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা।

নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহ:

১. নিরাপদ ও পরিষ্কার প্রসব।
২. নবজাতকের উষ্ণতা বজায় রাখা ও নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধ।
৩. নবজাতকের শ্বাস-প্রশ্বাস যাচাই করা ও প্রয়োজনে সহায়তা দেওয়া।
৪. জন্মের সাথে সাথে (১ ঘণ্টার মধ্যে) মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করা ও ৬ মাস পর্যন্ত কেবল মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো।
৫. কম ওজনে জন্ম নেয়া এবং অপরিণত নবজাতকের বিশেষ যত্ন নেওয়া।
৬. নবজাতকের বিপদ চিহ্ন শনাক্ত করে সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ।

নবজাতককে উষ্ণ রাখা

শিশু জন্মের পরপর শরীরের তাপ দ্রুত হারাতে থাকে। ফলে শিশুর তাপমাত্রা কমে যায়। তাই নবজাতককে জন্মের পর পরই উষ্ণ রাখা প্রয়োজন। এজন্য যা করণীয়:

১. জন্মের পরপরই একটি পরিষ্কার ও শুকনো নরম সুতি কাপড় দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নবজাতককে মুছে শুষ্ক করে তোলা। ভেজা কাপড় সরিয়ে আরেকটি পরিষ্কার শুকনো কাপড়/কম্বল দিয়ে মা ও শিশুকে ঢেকে দিতে হবে।

২. নবজাতকের মাথা টুপি/কাপড় দিয়ে ঢেকে তাকে মায়ের বুকের সংস্পর্শে রাখতে হবে।

জন্মের সাথে সাথে দ্রুত নবজাতককে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো

জন্মের সাথে সাথে অবশ্যই এক ঘন্টার মধ্যে নবজাতককে মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। শাল দুধে অধিক পরিমাণে এন্টিবডি থাকে যা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। শিশুকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। অন্য কোন খাবার দেওয়া, এমনকি এক ফোঁটা পানি খাওয়ানোরও প্রয়োজন নেই। জন্মের পর পর শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য মাকে যথাযথ সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন।

সময়মত টিকা দেওয়া

ইপিআই সময়সূচি অনুসারে শিশুকে টিকা দিতে হবে।

নবজাতকের সংক্রমণ প্রতিরোধ

১. নবজাতককে প্রতিবার সেবা প্রদান, মায়ের দুধ খাওয়ানো ও স্পর্শের পূর্বে এবং মলমূত্র পরিষ্কারের পর অবশ্যই সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়া।

২. প্রসবের ক্ষেত্রে নাড়ি কাটার জন্য জীবাণুমুক্ত ব্লেড এবং নাড়ি বাঁধার জন্য জীবাণুমুক্ত সুতা ব্যবহার করা।

৩. নাড়ি কাটা ও বাঁধার পর ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন নবজাতকের নাড়িতে এমনভাবে লাগানো যেন সম্পূর্ণ নাড়িটি ভালোভাবে ভিজে যায়।

৪. একবার ক্লোরডেক্সিডিন লাগানোর পর নাড়িতে অন্য কিছুই না লাগানো এবং নাড়ি শুষ্ক রাখা।

মূলবার্তা:

- জন্মের সাথে সাথে, অবশ্যই এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ (শালদুধ) খাওয়ানো।
- নবজাতকের বিপদ চিহ্নসমূহ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। নবজাতকের মৃত্যু প্রতিরোধে ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম জেনে রাখতে হবে।
- নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহ নিশ্চিত করতে হবে।
- সময়মত টিকা দেওয়া এবং নবজাতকের সংক্রমণ প্রতিরোধ।

সেশন: ১০

নিরাপদ খাবার, পানি ও খাবারের গুণগত মান

নির্দেশনা-১৫ সময়: ১০ মিনিট

নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ধারণা ও সচেতনতা বলতে কি বোঝায়, তা অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিন। এরপর নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার কী, নিরাপদ পানি কাকে বলে, নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও পানির প্রয়োজনীয়তা কেন রয়েছে, নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও পানি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কী করণীয়, এসকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন। আলোচনার পাশাপাশি প্রদত্ত ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শন করুন ও বিষয়বস্তু চিহ্নিত করুন।

নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার

নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার হল সেই খাবার যা সঠিক নিয়মে, পরিষ্কার ও নিরাপদভাবে সংগ্রহ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং খাবারে রোগজীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি কম থাকে। উৎপাদন থেকে শুরু করে আহার করা পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে খাবার নিরাপদ ও পরিষ্কার রাখা উচিত।

নিরাপদ পানি

নিরাপদ পানি হল বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন পানি, যা পান করলে আমাদের শারীরিক ক্ষতি হয় না। পানযোগ্য নিরাপদ পানিতে আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর পরিমাণ স্বীকৃত ক্ষতিকারক মাত্রা থেকে কম থাকে।

নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও পানির প্রয়োজনীয়তা

১. অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি এবং বাইরের খোলা খাবার খেলে ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

২. কোন খাবার বা পানীয়তে কৃত্রিম রঙ দেয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। রঙ দেয়ার ফলে অ্যালার্জি কিংবা চর্মরোগ থেকে শুরু করে প্রাণঘাতী ক্যান্সারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও পানি নিশ্চিত করার জন্য করণীয় বিষয়সমূহ

ক) পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন

১. খাবার তৈরি, পরিবেশন ও শিশুকে খাওয়ানোর আগে হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

২. খাবারের প্লেট, বাটি, তৈজসপত্র, দা, বটি ইত্যাদি ব্যবহারের আগে সাবান ও পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।

৩. রান্নাঘর ও এর আশেপাশের জায়গা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

৪. হাঁচি বা কাশি দেয়ার সময় নাক ও মুখ ঢেকে রাখতে হবে।

৫. পশু-পাখি পরিচর্যার পর হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

খ) কাঁচা এবং রান্না করা খাবার আলাদা রাখুন

১. রান্না করা খাবার থেকে কাঁচা মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদি আলাদা রাখতে হবে।
২. কাঁচা মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদি কাটার জন্য পরিষ্কার ছুরি বা বটি ব্যবহার করুন।

গ) সঠিকভাবে রান্না করুন

১. মাছ, মাংস, ডিম ভাল করে সেদ্ধ করে রান্না করতে হবে।
২. রান্না করে রাখা খাবার খাওয়ার আগে ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে।
৩. দুধ ভালোভাবে ফুটিয়ে পান করতে হবে।

ঘ) নিরাপদ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন

১. রান্না করা খাবার ঘরের তাপমাত্রায় ২ ঘণ্টার বেশি না রাখা।
২. খাবার অবশিষ্ট থাকলে তা ফ্রিজে রাখতে হবে অথবা ৬০° সে. তাপমাত্রার উপরে রাখতে হবে এবং ফ্রিজে রাখা খাবার পুণরায় ৭৫° সে. তাপমাত্রায় অন্তত ১০ মিনিট গরম করে খেতে হবে।
৩. রান্না করা খাবার একদিনের বেশি রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ না করাই ভালো।
৪. শিশুদের খাবার টাটকা হওয়া জরুরি।

ঙ) নিরাপদ পানি ব্যবহার করুন

১. রান্না ও খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় নিরাপদ পানি ব্যবহার করুন।
২. পানি পান করার আগে ফুটিয়ে নেয়া উচিত। যদি সম্ভব না হয় তাহলে ব্লিচিং পাউডার, ফিটকিরি, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি ব্যবহার করে সঠিক উপায়ে জীবাণুমুক্ত করে পরিষ্কার পাত্রে রাখতে হবে। পানি বিশুদ্ধকরণ উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জেনে নিতে হবে।
৩. পুকুর কিংবা নদীর পানি পান করা উচিত নয়।
৪. যদি ফল ও সবজি কাঁচা খেতে হয়, তাহলে নিরাপদ পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
৫. সবজি ও ফল-মূল কাটার পূর্বে এক চা চামচ খাবার লবণ নিরাপদ পানিতে মিশিয়ে কমপক্ষে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে শাক-সবজি ও ফলমূলে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব অনেকাংশে কমে যায়।
৬. প্রক্রিয়াজাত বা প্যাকেটজাত খাবারের মেয়াদ (Expiry Date) শেষ হলে, সে খাবার খাওয়া উচিত নয়।

ঝিরি থেকে বাঁশ ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সংগ্রহ করা যায়।

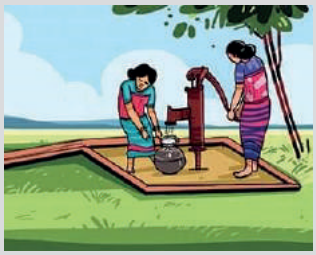

আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করা নিরাপদ।

সঠিক পদ্ধতিতে তৈরী ফিল্টার মেশিন ব্যবহার করে পানি নিরাপদ করা যায়।

মূলবার্তা:

- রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য সব সময় নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করতে হবে।
- রান্নার সঠিক উপায় জানতে হবে। সঠিক উপায়ে রান্নাকরা খাবার ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে।

সেশন: ১১

ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ

নির্দেশনা-১৬ সময়: ১০ মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন। যেমন: হাত ধোয়া, নিয়মিত নখ কাটা, দাঁতের যত্ন, গোসল করা, মাসিকের সময় যত্ন। স্বাস্থ্য সুরক্ষা কী? কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ কীভাবে করতে হয় বা সেবা পাওয়া যাবে, তা নিয়ে আলোচনা করুন। অংশগ্রহণকারীরা তাদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কতটা সচেতন এবং যথাযথভাবে তা পালন করে কি না তার একটি সমীক্ষা নিন। আলোচনার সাথে প্রদত্ত ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শন করুন।

হাত ধোয়া:

নিরাপদ পানযোগ্য পানি ও খাবার নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে খাবার গ্রহণের জন্য হাত পরিষ্কার রাখা দরকার। খাবার গ্রহণের আগে ও পরে হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। নাহলে নিরাপদ খাবার ও পানি গ্রহণের উদ্দেশ্য সফল হবে না। খাবার আগে এবং মলত্যাগের শেষে সঠিকভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মাধ্যমে ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
হাত ধোয়ার সঠিক নিয়মাবলী নিম্নরূপ-
(ধাপগুলোর ছবি)

হাতের কব্জি পর্যন্ত পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন

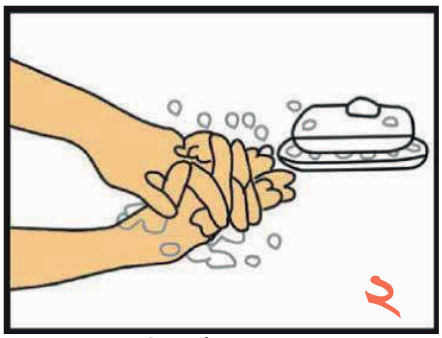

এবার হাতের কব্জি পর্যন্ত ভালভাবে সাবান লাগান

প্রচুর ফেনা করে দুই হাতের আংগুলের ভাঁজ/খাঁজ, নখের নীচসহ কব্জি পর্যন্ত কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে ঘষে নিন

প্রবাহমান পরিষ্কার পানির ধারায় দুই হাতের ফেনা ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন

নিয়মিত নখ কাটা:

প্রায় সব ধরনের কাজ আমরা হাত দিয়ে করি। হাতের এই রোগজীবাণু মুখের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে অসুস্থ করে তোলে। হাতের নখ বড় থাকলে নখের ভেতরে ময়লা জমে এবং খাবার গ্রহণের সময় এসব ময়লা সহজেই পেটে গিয়ে রোগাক্রান্ত করে। এভাবেই হাত দ্বারা রোগ-জীবাণু ছড়ায়।
এছাড়া খালি পায়ে পায়খানায় গেলে বা মাটিতে হাঁটলে পায়ের নিচে বা পায়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে কৃমি শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলেও রোগজীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে।

দাঁতের যত্ন:

১. নিয়মিত দাঁত এবং মাড়ির যত্ন নিতে হবে।
২. প্রতিবার খাওয়ার পর বিশেষ করে চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ার পর ভালোভাবে পানি দিয়ে মুখের ভেতর পরিষ্কার করতে হবে।
৩. সকালে ঘুম থেকে উঠার পর এবং রাতে খাওয়ার পরে অবশ্যই ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে দাঁত মাজতে হবে।

খাবার গ্রহণের পর সঠিকভাবে দাঁত পরিষ্কার না করলে দাঁতের ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রচুর পরিমাণে চিনি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং ফাস্টফুড গ্রহণের ফলে দাঁতের ক্ষয় হতে পারে। কিশোর-কিশোরীদের খাদ্য তালিকার পরিবর্তন, মদ এবং তামাক গ্রহণের ফলে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। দাঁত গঠনের সময় অপুষ্টির শিকার হলে পরবর্তীতে দাঁতের ক্ষয় হতে পারে।

গোসল করা:

নিয়মিত গোসল করতে হবে এবং শরীরের স্পর্শকাতর অংশ ভালোভাবে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

মাসিকের সময় যত্ন

মাসিকের সময় নিয়মিত গোসল করতে হবে। দিনে অন্তত ৩-৪ বার কাপড় বা স্যানিটারি ন্যাপকিন বদলাতে হবে। ব্যবহৃত কাপড় পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। প্রতিবার পায়খানা ব্যবহারের পর হাত ভালো করে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে ধুতে হবে। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য, সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ পেতে নিম্নলিখিত স্থানে যোগাযোগ করা যেতে পারে-

১. সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র

২. সূর্যের হাসি চিহ্নিত ক্লিনিক

৩. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র

৪. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

৫. মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

৬. জেলা সদর হাসপাতাল

২. স্কুল হেলথ ক্লিনিক

৮. সকল মেডিকেল কলেজে অবস্থিত মডেল ক্লিনিক

৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল মডেল ক্লিনিক

১০. মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসের এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা

১১. আজিমপুর এমসিএইচটিআই

১২. দেশের বিভিন্ন এনজিও ক্লিনিক

১৩. কমিউনিটি ক্লিনিক

১৪. শহর এলাকায় রংধনু ক্লিনিক

১৫. ব্রাক সুস্বাস্থ্য ক্লিনিক

১৬. মেরী স্টোপস ক্লিনিক

এছাড়াও এসএমসি সুরক্ষা কেন্দ্র ও গ্রামাঞ্চলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভালো ডিপোহোল্ডার ও স্বাস্থ্যকর্মী থেকে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য, সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ পাওয়া যেতে পারে।

মূলবার্তা:

- প্রসাব পায়খানা করার জন্য সবসময় স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার করতে হবে।
- স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহারের সময় অবশ্যই স্যান্ডেল পরতে হবে।
- পায়খানার পর টিস্যু অথবা পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করে হাত ভালো করে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে ধুতে হবে।
- হাত মুখ ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে।
- প্রতিবার খাবারের আগে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে।
- প্রতিবার খাবারের পর ভালোভাবে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাবার নিরাপদ পানি দিয়ে কুলি এবং গড়গড়া করে পরিষ্কার করতে হবে। ব্রাশ ব্যবহার করলে আরও ভালো।
- আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানযোগ্য পানি পরিষ্কার গ্লাসে দিনে ৬-৮ গ্লাস পান করতে হবে।
- ঘরের বাইওে হাঁটার সময় অবশ্যই জুতা/স্যান্ডেল ব্যবহার করতে হবে।
- সর্দি-কাশি এবং হাঁচি দেয়ার সময় অবশ্যই নাক ও মুখে রুমাল/টিস্যু ব্যবহার করতে হবে।

Funded by the European Union

LEAN
Leadership to Ensure Adequate Nutrition

Beyond aid

Visit: united-purpose.org
United Purpose, Floor 3 & 4, House 26, Road 28, Block K, Banani, Dhaka 1213, Bangladesh

কনসোর্টিয়াম সদস্য

United Purpose Beyond aid
HELVETAS BANGLADESH
gain Global Alliance for Improved Nutrition
IDF
jum

সহ-অর্থায়নে

pennyappeal
Kingdom of the Netherlands

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

*এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে প্রণীত হয়েছে। প্রকাশনার সকল তথ্যের দায়ভার ইউনাইটেড পারপাসের। এতে ইউরোপিয়ান কমিশনের মতামতের কোন প্রতিফলন নেই।